বলাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

৯

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ ?
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ ?
তাই দেবলোক-পানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দমঞ্জরী ;
তাই তো তোমারে ঘিরি বহে বারোমাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিশ্বাস ;
মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে
ম্লান দীপালোকে
ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রু-গলা গান
তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান
হে পাষাণ, অমর পাষাণ।

বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি
সে রাজবিরহী
বিরহের রত্নখানি ;
দিল আনি
বিশ্বলোক-হাতে
সবার সাক্ষাতে।
নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,
ঘিরিয়া ধরেছে তারে দশ দিক।

আকাশ তাহার 'পরে
যত্নভরে
রেখে দেয় নীরব চুম্বন
চিরন্তন;
প্রথম মিলনপ্রভা
রক্তশোভা
দেয় তারে প্রভাত-অরুণ,
বিরহের ম্লানহাসে
পাণ্ডুভাসে
জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণ।

সম্রাট্‌মহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি সে অনঙ্গস্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।
রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

প্রকাশ মে ১৯১৬
সংস্করণ ১৯২১
পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৩, বৈশাখ ১৩৩৯, মাঘ ১৩৪৫
নূতন সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৩৫০, মাঘ ১৩৫১, মাঘ ১৩৫২
আশ্বিন ১৩৫৭, মাঘ ১৩৬০, শ্রাবণ ১৩৬৩, আষাঢ় ১৩৬৬

রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা -সহ শতবর্ষপূর্তি-সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৬৭ : ১৮৮২ শক

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক্‌স্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

১০·১

সূচীপত্র

উৎসর্গ

উইলি পিয়র্‌সন্‌ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

ছোটোরে কখনো ছোটো নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য—
তোমারে আদরি আপনারে করি ধন্য।

৭ মে ১৯১৬
তোসা-মারু জাহাজ
বঙ্গসাগর

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায় ;
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ-যে প্রবীণ, ঐ-যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে-আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

বাহির-পানে তাকায় না যে কেউ—
দেখে না যে বান ডেকেছে,
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, এ কী বিষম কাণ্ডখানা!
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।

শিকলদেবীর ঐ-যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া!
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর্ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে—
ঘুচিয়ে দে, ভাই, পুঁথিপোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুলমাল্যগাছা।
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ ১৩২১

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্তমেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো!
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে।
এই বেলা নে বরণ ক'রে
সব দিয়ে তোর ইহারে।
চাহিস নে আর আগুপিছু,
রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর্ মাথা নিচু
সিক্ত আকুল কেশে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে।
গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ
নিবল শয়ন-শিয়রে।

ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো ?
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

ছি ছি রে, ঐ চোখের জল আর ফেলিস নে।
ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে,
কোণে আঁচল মেলিস নে।
কিসের তরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক-না তোর দ্বারের শিকল,
বাহির-পানে ছোট্-না সকল
দুঃখসুখের শেষে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না ?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠবে না ?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল— সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয় রে সেজে,
আয়-না বধূর বেশে গো।
ঐ বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো।

রামগড়
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

৩

আমরা চলি সমুখ-পানে,
কে আমাদের বাঁধবে ?
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্তপায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলই ফাঁদ ফাঁদবে,
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।
মন ছড়ালো আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি খেপে ;
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর-গিরি করব রে জয়,
যাব তাদের লঙ্ঘি।
একলা পথে করি নে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপনি মেতে
আছে ওরা গণ্ডী পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধবে ওদের বাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ,
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান,
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আনব হ'রে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ-সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রামগড়
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

৪

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
কেমন করে সইব ?
বাতাস আলো গেল মরে,
একি রে দুর্দৈব !
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,
আয়-না রে নিঃশঙ্ক !
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে
ওই-যে অভয়শঙ্খ।

চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তিস্বর্গ !
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

আরতিদীপ এই কি জ্বালা ?
এই কি আমার সন্ধ্যা ?
গাঁথব রক্তজবার মালা ?
হায় রজনীগন্ধা !
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক ।
হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ ।

যৌবনেরই পরশ-মণি
করাও তবে স্পর্শ ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্‌বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও-না আতঙ্ক ।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ ।

জানি জানি, তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে ।
জানি শ্রাবণ-ধারা-সম
বাণ বাজিবে বক্ষে ।

কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

রামগড়
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

৫

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ-যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালী-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগর-সাথে মিশে ;
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে—
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূল-ছাড়া মোর নেয়ে ?

এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে ?
সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আসছে তরী বেয়ে।
কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
পথ-হারা কোন পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে ?
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথি
বিরহী মোর নেয়ে।

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
বিবাগী মোর নেয়ে ?
নাহি জানি, পূর্ণ ক'রে কোন্ রতনের বোঝা
আসছে তরী বেয়ে।
নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার—
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আন্‌মনে গান গেয়ে।
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে ?

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।
তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আসছে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্তপলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
ঐ-যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে, বাহির হল কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয় নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে
আসতে তরী বেয়ে।

বাজবে নাকো তূরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ—
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ—
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক-পরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ,
কূলে আসবে নেয়ে।

কলিকাতা
৫ ভাদ্র ১৩২১

৬

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা ?
—ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও ?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও ?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন।
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে ?
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে,
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে,
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়—

এই ধূলি এও সত্য হায় ;
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন,
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;
সে যে আজ হল কত কাল !
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে !
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে

তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশপাথারে ;
পথের দু ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরনে বরনে ;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবননির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি, ওই তারা, ওই শশীরবি,
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি ?
তুমি ছবি ?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে

নিস্তব্ধ ক্রন্দনে ?
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মরমুখর ছায়া মাধবীবনের
হ'ত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল ?
ভুলি নে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা, নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই

শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে,
তব সুর বাজে মোর গানে;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

এলাহাবাদ
রাত্রি। ৩ কার্তিক ১৩২১

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বারবার

কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল' নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে

করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌনজাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে—

ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলি-'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনাকল্লোল-সাথে নহবত মিলায় না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া

যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

মিথ্যা কথা— কে বলে যে ভোল' নাই?
কে বলে রে খোল' নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন

পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে—
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-'পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে ;
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—

'যত দূর চাই
নাই নাই, সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

এলাহাবাদ
রাত্রি। ১৪ কার্তিক ১৩২১

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা— ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;

আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, করো না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে

দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ—
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,

কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা-কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।

ওরে দেখ্, সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে— অকূল আলোতে।

এলাহাবাদ
রাত্রি। ৩ পৌষ ১৩২১

সম্রাটের মন
সম্রাটের ধনজন
এই রাজকীর্তি হতে করিয়াছে বিদায়গ্রহণ।
আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণসুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

এলাহাবাদ
প্রভাতে। ৫ পৌষ ১৩২১

১০

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান?
প্রভাতের গান?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির 'পরে;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে?
কী তোমারে দিব আনি?
সন্ধ্যাদীপখানি?
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায়?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার?
হোক ফুল, হোক-না গলার হার,
তার ভার
কেনই বা সবে

একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে !
নিজ হতে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি।

তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি—
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে—
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।

বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে, না জানিতে, সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান।

শান্তিনিকেতন
১০ পৌষ ১৩২১

১১

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কারা সবে ধুলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায় !
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার।
তার পরে দেখি,
এ কী,
খোলা তব বিচার-ঘরের দ্বার,
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের 'পরে ;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা
তাদের মত্ততা-পানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধুলা দিয়ে যারা চলে যায়।

হে সুন্দর,
তোমার বিচার-ঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্যসমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গকূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লববীজনে।

প্রেমিক আমার,
তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বার।
লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি—
খড়্গ ধরো প্রেমিক আমার,
করো গো বিচার।
তার পরে দেখি,
এ কী,
কোথা তব বিচার-আগার!
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা-'পরে;

প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহ-শেল ক্ষতবক্ষে করি লয় গ্রাস।
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার-আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনা-মাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে,
সখার হৃদয়রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তারা, মুগ্ধ তারা, হয়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সংগোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।
চোরা-ধন দুর্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার—
এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার!
চেয়ে দেখি, মার্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে;
সেই ঝড়ে

ধুলায় তাহারা পড়ে ;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে বাতাসে কোথা যায় বয়ে !
হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান-বজ্রাগ্নি-শিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে ।

শান্তিনিকেতন
১২ পৌষ ১৩২১

১২

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
স্থখে দুঃখে উঠে নেবে
বাড়ায়েছি হাত
দিন রাত;
কেবল ভেবেছি দেবে দেবে, আরো কিছু দেবে।

দিলে তুমি, দিলে শুধু, দিলে;
কভু পলে পলে তিলে তিলে,
কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
দানের শ্রাবণে।
নিয়েছি, ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়ায়ে,
হাতে পায়ে রেখেছি জড়ায়ে
জালের মতন;
দানের রতন
লাগিয়েছি ধূলার খেলায়
অযত্নে হেলায়,
আলস্যের ভরে
ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে।
তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে;
তোমার দানের পাত্র নিত্য ভরে উঠিছে নিখিলে।

অজস্র তোমার
সে নিত্য দানের ভার

আজি আর
পারি না বহিতে।
পারি না সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা,
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে,
তত চেয়ে চেয়ে,
পাওয়া মোর, চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়,
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পুরাইবে কবে?
শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
ধুলায় ফেলিয়া টানি—
সারারাত্রি-পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় প'রে—
লবে মোরে, লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হতে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে।

শান্তিনিকেতন
১৩ পৌষ ১৩২১

১৩

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;
নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশিরমন্থর।

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।
বিরহী তোমার লাগি
আছি জাগি

দক্ষিণবাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে,
কত মধুমধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।

লিখেছে সে—
এসো এসো, চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝ'রে পড়ে ফোটা ফুল, খ'সে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার ;
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।

সুরুল
২৩ পৌষ ১৩২১

১৪

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

সেইমত আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
এক বেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

শান্তিনিকেতন
২৬ পৌষ ১৩২১

১৫

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করে নি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে—
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়।

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

সুরুল
২৭ পৌষ ১৩২১

১৬

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি ;
ধুলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে
আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হতে সাথি।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল ;
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি
কাষ্ঠলোষ্ট্রসুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।
চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি,
সেই তো নগরী।

এ তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

অতীতের গৃহছাড়া কত-যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি ;
খোঁজে তারা আমার বাণীরে
লোকালয়তীরে-তীরে।
আলোকতীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্তগুহা ছাড়ি ;
দেয় পাড়ি
অদৃশ্যের অন্ধ মরু, ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে,
আকারের অসহ্য পিয়াসে।

কী জানি কে তারা কবে
কোথা পার হবে
যুগান্তরে,
দূর সৃষ্টি-'পরে
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব আলোতে।
আজ তারা কোথা হতে
মেলেছিল ডানা
সেদিন তা রহিবে অজানা।
অকস্মাৎ পাবে তারে কোন্ কবি,
বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি—

গাঁথিবে তাহারে কোন্ হর্ম্যচূড়ে
সেই রাজপুরে
আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।
তার তরে কোথা রচে ঠাঁই
অরচিত দূর যজ্ঞভূমে ?
কামানের ধূমে
কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম !

সুরুল
২৭ পৌষ ১৩২১

১৭

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে ;
কী যে হল কানাকানি,
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।
মুগ্ধ চক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে।

সুরুল
২৮ পৌষ ১৩২১

১৮

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যতকিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই ;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন ;
ততক্ষণ
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন ;
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে, পক্ককেশে।

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

ওগো, আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস পিছে ?
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রব না ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

সুরুল
প্রাতঃকাল। ২৯ পৌষ ১৩২১

১৯

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা—
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেইমত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

সুরুল
প্রাতঃকাল। ২৯ পৌষ ১৩২১

২০

আনন্দগান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।

যাবার হাওয়া ঐ যে উঠেছে— ওগো,
ঐ যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম যে ছুটেছে।

হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে।
কে গো তুমি, দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্-না ভাসিতে।

কোনো কালে হয় নি যারে দেখা— ওগো,
তারি বিরহে
এমন ক'রে ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে?

বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে।
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।

রেলগাড়ি
২৯ পৌষ ১৩২১

২১

ওরে, তোদের তর সহে না আর ?
এখনো শীত হয় নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান ?
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল ?

মরণপথে তোরা প্রথম দল,
ভাবলি নে তো সময় অসময়।
শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল
গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।
সবার আগে উচ্চে হেসে ঠেলাঠেলি ক'রে
উঠলি ফুটে, রাশি রাশি পড়লি ঝরে ঝরে।

বসন্ত সে আসবে যে ফাল্গুনে
দখিন-হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি—
তাহার লাগি রইলি নে দিন গুনে,
আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি!
রাত না হতে পথের শেষে পৌঁছবি কোন্ মতে—
যা ছিল তোর কেঁদে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে।

ওরে খেপা, ওরে হিসাব-ভোলা,
দূর হতে তার পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধুলা
তোরা আপন মরণ দিলি পেতে।
না দেখে না শুনেই তোদের পড়ল বাঁধন খসে,
চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলি নে আর বসে।

কলিকাতা
৮ মাঘ ১৩২১

২২

যখন আমায় হাতে ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি আপন পাশে,
রাত্রিদিবস ছিলেম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,
চলতে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছামতে
কোনো দিকে এক পা বাড়াই
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই।

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠল বাজি
অনাদরের কঠিন ঘায়ে,
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই-যে আমার হল ছুটি—
ভাঙল আমার মানের খুঁটি,
খসল বেড়ি হাতে পায়ে ;
এই-যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়?
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তিমদে করল মাতাল।
খসে-পড়া তারার সাথে
নিশীথ-রাতে
ঝাঁপ দিয়েছি অতল-পানে
মরণ-টানে।

আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধন-ছাড়া,
ঝড় তাহারে দিল তাড়া;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্রমানিক দুলিয়ে নিল গলার হারে;
একলা আপন তেজে
ছুটল সে যে
অনাদরের মুক্তিপথের 'পরে
তোমার চরণ-ধুলায়-রঙিন চরম সমাদরে।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারই নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।

আঘাত হানি
তোমারই আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদনখানি।

শিলাইদা। কুঠিবাড়ি
রাত্রি। ১৯ মাঘ ১৩২১

২৩

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি!
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—
দু হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ-পানে

অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

পদ্মাতীরে
২০ মাঘ ১৩২১

২৪

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই—
তার ঠিক-ঠিকানা নাই।
তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ,
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা,
ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুষ।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির ’পরে ধুলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুরই তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গে।

আমার গানে স্বর্গ আজি
ওঠে বাজি,
আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়,
আকাশ-ভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়।

দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজল যে তাই শঙ্খ,
সপ্তসাগর বাজায় বিজয়ডঙ্ক,
তাই ফুটেছে ফুল,
বনের পাতায় ঝর্নাধারায় তাই রে হুলুস্থূল।
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটিমায়ের কোলে,
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দকল্লোলে।

শিলাইদা। কুঠিবাড়ি
২০ মাঘ ১৩২১

২৫

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে,
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে,
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

পদ্মা
২০ মাঘ ১৩২১

২৬

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই-যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরন হৃদয়-ব্যথার মতো ;
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠল কেবল মর্মরকল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাগুন-দিনের কাল
দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল,
সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল ;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে ;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।

পদ্মা
২২ মাঘ ১৩২১

২৭

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজানা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি,
রাখব দেনা বাকি।
যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে,
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে,
তলব তারই আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

তাই জেনেছি, আমি তাহার নইকো অজানা।
তাই জেনেছি, ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা।
তাই ভেবেছি, জীবন-মরণে
যা আছে সব চুকিয়ে দেব চরণে।
তাহার পরে
নিজের জোরে
নিজেরই স্বত্বে
মিলবে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজত্বে।

পদ্মা
২২ মাঘ ১৩২১

২৮

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ যত বোঝা
তাই নিয়ে চলি পথে, কভু বাঁকা, কভু সোজা—
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন ;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি ;
সুখস্বপ্নরসরাশি
ঢালে তাই ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

পদ্মাতীর
২৪ মাঘ ১৩২১

২৯

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ;
এ পার হতে ও পার বেয়ে
বয় নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণ-মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক ;
আমি এলেম, এল তোমার দুখ ;
আমি এলেম, এল তোমার আগুন-ভরা আনন্দ—
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।

আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে—
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয়;
দেখতে তোমায় বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি, তবু
আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল—
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল।

পদ্মাতীর
২৫ মাঘ ১৩২১

৩০

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দুদিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা,
তার পরে তার খবর কী যে ধারি নে তার ধার গো—
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী, সেই আমার আনন্দ।
সেই তো বাধায়, সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ—
এক নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দয়।
মানে না সে বুদ্ধিসুদ্ধি, বৃদ্ধ জনার যুক্তি—
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

ভাবিস বসে যে দিন গেছে সে দিন কি আর ফিরবে,
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে।

ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না—
সেই কূলে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেছিস, পিছন তোরে ঘিরবে—
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে।

ঘণ্টা যে ঐ বাজল কবি, হোক রে সভাভঙ্গ—
জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ।
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,
তাই তো দোলে বুক।
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ—
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ!

পদ্মাতীর
২৬ মাঘ ১৩২১

৩১

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে,
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই তো একে একে
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার করে লবে—
এমনি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য তব
তোমার আপন-কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।
এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।
এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরান করি হিরণ্ময়।

পদ্মা
২৭ মাঘ ১৩২১

৩২

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারে।
চক্রবাকের-নিদ্রা-নীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই-যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতশিরে
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার ;
ঐ-যে মরি-মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী ;
ঐ-যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়,
ঘুমে অলস কায় ;
ঐ-যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায় ;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে—
তোমার অনন্ত-মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে
আর হবে না কভু।
এমনি করেই, প্রভু,
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

পদ্মা। ২৭ মাঘ ১৩২১

৩৩

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুশি হয়ে পথের পানে চাও।
খুশি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ-আভাসে।
খুশি তোমার ফাগুন-বনে আকুল হয়ে পড়ে
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।
আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে
তোমার সাগর অধিক ক'রে নাচে
দিনের পরে দিনে।

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

পদ্মাতীর
২৭ মাঘ ১৩২১

৩৪

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।
দেখতে পেলেম, তুমি মোরে
সদাই ডাক যে নাম ধ'রে
সে নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকালবেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানে।
মনে হল আমারই প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান,
আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণমূলে
নেব আমি শিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।

সুরুল
২১ চৈত্র ১৩২১

৩৫

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় ক'রে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে
তাই তো আমি জানি—
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানস-সাগর-জলে
কমল টলমল।
তাই তো আমি জানি—
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান,
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
আলোক জ্বলজ্বল।

শ্রীনগর। কাশ্মীর
৭ কার্তিক ১৩২২

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্চামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!'

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।

তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম, আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

শ্রীনগর
কার্তিক ১৩২২

৩৭

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন-
-মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
'তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর-পানে
দিতে হবে পাড়ি।'
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারি দিক হতে ওই দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।

'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর'
এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে ; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী—
'নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।'

বাহিরিয়া এল কারা ? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন-মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল ;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
'বন্দরের কাল হল শেষ।'

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার,
তরঙ্গের সাথে লড়ি

বাহিয়া চলিতে হবে তরী ;
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসাহলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
উর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।

হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত,
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি ? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান—
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।

ভেসে যায় তারা সরে যায়,
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে—
'তোরে নাহি করি ভয় ;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।'

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ-সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশলজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাসরবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো ?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?

রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

কলিকাতা
২৩ কার্তিক ১৩২২

৩৮

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখতে কি পায় কেউ ?
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহগানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি।

আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজার বার
নূতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে যতন-ভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে দেয় যে তারে আনি।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদন-ভরা শুধু চোখের গানে।
মিলব তখন বিশ্ব-মাঝে আমরা দোঁহে একা,
যেন নূতন দেখা।
তখন আমার অঙ্গ ভরি নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ—
তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানি,
কখনো জাফ্‌রানি—
আজ তোরা দেখ্‌ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টিধোওয়া আকাশ যেন নবীন আস্‌মানি।

অকূলের এই বর্ণ এ-যে দিশাহারার নীল—
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইছে দূরের হাওয়া
সাগর-পানে-ধাওয়া।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টিভরা ঈশানকোণের নব মেঘের বাণী।

পদ্মা
১২ অগ্রহায়ণ ১৩২২

৩৯

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে ; ভেবেছিল, বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন ; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্পবিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্যবন্দনাসংগীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের 'পরে ;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া ; তাই হেরো যুগান্তরশেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

শিলাইদহ
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩২২

৪০

এইক্ষণে
মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়নবাতায়নে
যে তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলোতে
সে তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সংগীত,
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।

আজি মনে হয়, বারে বারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছ কত দেখা—
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা।
সেইসব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে—
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে।

কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলিলগনে।
তাই আজি নিখিল গগনে

অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝংকারি উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড় ;
তাই আজি দক্ষিণপবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

শিলাইদা
৭ ফাল্গুন ১৩২২

√৪১

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখিসম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়,
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ;
নদীর এ পারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ও পারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না-চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষনিহত
আধোজাগা নয়নের মতো।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে— ফসল-খেতের যেন মিতা—
নদী-সাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা।

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলিকল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা— এইসব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমত অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দবেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

পদ্মা
৮ ফাল্গুন ১৩২২

৪২

তোমারে কি বার বার করেছিনু অপমান ?
এসেছিলে গেয়ে গান
ভোরবেলা ;
ঘুম ভাঙাইলে ব'লে মেরেছিনু ঢেলা
বাতায়ন হতে,
পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে !
ক্ষুধিতদরিদ্রসম
মধ্যাহ্নে এসেছ দ্বারে মম ।
ভেবেছিনু, 'একি দায় !
কাজের ব্যাঘাত এ যে !'— দূর হতে করেছি বিদায় ।

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অদ্ভুত
দুঃস্বপ্নের মতো ।
দস্যু ব'লে শত্রু ব'লে ঘরে দ্বার যত
দিনু রোধ করি ।
গেলে চলি, অন্ধকার উঠিল শিহরি ।
এরই লাগি এসেছিলে হে বন্ধু অজানা—
তোমারে করিব মানা,
তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,
তোমা-কাছে যত ধার সকলই ধারিব,
না করিয়া শোধ
দুয়ার করিব রোধ ।

তার পরে অর্ধরাতে
দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধুলাতে
মনে হবে আমি বড়ো একা
যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।
এ দীর্ঘ জীবন ধরি
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে,
যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,
অর্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারে-বারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারে-বারে-ফিরে-আসা হয়ে।

শিলাইদা
৮ ফাল্গুন ১৩২২

৪৩

ভাব্‌না নিয়ে মরিস কেন খেপে ?
দুঃখসুখের লীলা
ভাবিস এ কি রইবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন শিলা ?
চলেছিস রে চলাচলের পথে
কোন্‌ সারথির উধাও মনোরথে—
নিমেষ-তরে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ ঢিলা।

শিশু হয়ে এলি মায়ের কোলে,
সেদিন গেল ভেসে।
যৌবনেরই বিষম দোলার দোলে
কাটল কেঁদে হেসে।
রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা ?
আবার কবে কী সুর বাঁধা হবে
আজকে পালার শেষে !

চলতে যাদের হবে চিরকালই
নাইকো তাদের ভার।
কোথা তাদের রইবে থলিথালি,
কোথা বা সংসার !

দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণাপাকের হাওয়া
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চলছে নিরাকার।

ওরে পথিক, ধর্‌-না চলার গান,
বাজা রে একতারা ?
এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইকো কূলকিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্নাহাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণ-বসন্তে তুই যে দখিন-হাওয়া
গৃহবাঁধন-হারা।

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ।
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা—
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সামনে সেও প্রেমের-কাঁদন-ভরা
চিরনিরুদ্দেশ।

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।

প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
এমনি ভালোবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর বাঁশি বাজবে গো এই সুরে,
কোন্ মুখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুটবে আবার হেসে!

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
মেলেছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলেম তান।
এত কালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরে
নেব যে তার গান।

সে গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলিবনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তার বরণমালাখানি
পরালো মোর শিরে।

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুধু নিমেষ-তরে।
সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে একা
উদাস প্রান্তরে।
এমনি করেই তার সে আসা-যাওয়া,
এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে
মর্মরে মর্মরে।

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।
তারে নিয়ে হল না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা—
এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরই জাল-বোনা।

শান্তিনিকেতন
২৯ ফাল্গুন ১৩২২

৪৪

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে ?
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের 'পরে
পুচ্ছ নাচাতে।
তুই পথহীন সাগর-পারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া ;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোর যে দাবি-দাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল আয়ুর ভিখারি ?
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারি।
মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে ;
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোমটা টানি।
সেই আবরণ দেখ্ রে উতারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি।

যৌবন রে, রয়েছ কোন্ তানের সাধনে ?
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে ?
তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপনাকে তার চিনায়,
তোমার বাণী জাগে প্রলয়-মেঘে
ঝড়ের ঝংকারে—
ঢেউয়ের 'পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয়-ডঙ্কা রে।

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে ?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।
খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা,
জীর্ণতারই বক্ষ দু-ফাঁক ক'রে
অমর পুষ্প তব
আলোক-পানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব।

যৌবন রে, তুই কি হবি ধুলায় লুণ্ঠিত ?
আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানিভারে
রইবি কুণ্ঠিত ?
প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি,
আগুন আছে ঊর্ধ্বশিখা জ্বেলে—

তোমার সে যে কবি।
সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

শান্তিনিকেতন
৪ চৈত্র ১৩২২

৪৫

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী !
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হতে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা,
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা—
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী—
ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী।
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পাত্র চুর।
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী,
গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।

কলিকাতা
৯ বৈশাখ ১৩২৩

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক

বলাকার ব্যাখ্যা ও আলোচনা[১]

ভূমিকা

এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। পরে চার-পাঁচটি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিক ভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে 'বলাকা' বলা হয়েছে। হংস-শ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা করে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।

১ ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা

এই কবিতার মূলগত ভাবটি এই— যৌবনের যে-একটি প্রবলতা সে সমস্তকে ভেঙে পরখ করে প্রত্যক্ষ করে দেখতে চায়। শাস্ত্রবাক্য আপ্তবাক্য এ-সব তার জন্য নয়। প্রবীণতা চায় যে-কোনো মতে পরের অভিজ্ঞতার বলে বিঘ্ন ব্যথাকে এড়িয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তারা আবার তাদের প্রবীণতার বোঝা চাপিয়ে দেবে। বাঁধা বুলি না মেনে প্রত্যক্ষের দ্বারা সব-কিছু অনুভব করার মধ্যে বেদনা আছে। কারণ, তাতে পরের অভিজ্ঞতার কর্ণধারত্ব নেই এবং বাঁধা পথের নির্বিঘ্নতাও নেই— কিন্তু এই তো যৌবনের ধর্ম। যৌবনই বিশ্বের ধর্ম, জরাটা মিথ্যা। যৌবন জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।

এই কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লিখিত।

---

১ 'বিশ্বভারতীর সাহিত্যক্লাসে আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যাপনার সময়ে' শ্রীপ্রদ্যোত-কুমার সেন -কর্তৃক অনুলিখিত ও শান্তিনিকেতন পত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ - মাঘ ১৩৩০) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২ সর্বনেশে : এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো

'সর্বনেশে' একটি রূপক বা symbol নয়। অন্তরে বা বাহিরে যদি সর্বনেশে আসে তবে তার কেমনতর অভ্যর্থনা হবে? গ্রহণ না পলায়ন? এটাই চিন্তনীয় ছিল। দুঃখকালেই অন্তরের ও সমাজের প্রচ্ছন্ন সম্পদ দেখা দেয়। দুঃখের দিন ছাড়া অপ্রত্যক্ষ অন্তরসম্পদ আপনাকে প্রকাশ করে না। গত যুদ্ধকালে কত অখ্যাতনামা হীন দীন জন নিজেকে প্রত্যক্ষ করিয়েছে এবং নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করেছে।

তৃতীয় স্তবক ॥ জ্ঞাত বস্তুর অভ্যাস অজ্ঞাতের ডাককে বাধা দেয়। আজ দুঃখের মরণের আহ্বানে নিরুদ্দেশের আহ্বানে জ্ঞাত অভ্যাসের মূলচ্ছেদ হল। অত্যন্ত নির্দিষ্ট আশ্রয়কেই 'ভিত্' বলা হয়েছে। ব্যক্তির ও মানবের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ আহ্বানের যুগ আছে। তখন বাহির ও ঘরের বিরোধ বাধে।

পঞ্চম স্তবক ॥ তরুণী যেমন পিতার ঘর ছেড়ে পতিগৃহে গিয়ে নিজ যৌবনের সার্থকতা লাভ করে তেমনি আজ আমার অন্তরাত্মাকে পরিচিত ভূমি ছেড়ে অজানার দিকে আনন্দযাত্রা করতে হবে। এতে দুঃখ আছে, তবু এ সর্বনাশ নয়, কারণ এ পতিগৃহে যাত্রার মতো।

আলোচনা ॥ য়ুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্তা এই কবিতা লেখবার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে যেন এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্‌বেগ ছিল। আমার যেন একটা নূতন অভিযান, adventure আরম্ভ হবে। হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করে সর্বনেশের জন্য অর্ঘ্য রচনা করতে হবে। কেবল মতামত নয়, প্রাচীন মতামত সংস্কার প্রভৃতি যা-কিছু প্রিয় সব পিতৃগৃহের মতো ত্যাগ করে নব রক্তপট্টাম্বরে পতিকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ সর্বনাশের যে যুগসন্ধিক্ষণ এসেছে।

৩ আমরা চলি সমুখ-পানে

এই কবিতায় আমার আগের দুটি কবিতার ধারাটিই চলে এসেছে। 'বলাকা'র প্রথম কবিতাতে এই ভাবটিই ছিল— যৌবনের জয়ধ্বনির কথা, মৃত্যুর ভিতর

দিয়ে পূর্বযুগের গণ্ডী ভেঙে ফেলে মুক্তি লাভ করে নূতন করে জীবনকে গড়ে তোলার কথা।

প্রতি যুগের যুবাদের উপর এই ভারটি রয়েছে, তারাই প্রলয়ের ভিতর দিয়ে চিরন্তন সত্যের নূতন পরিচয়কে লাভ করবে। এবারকার যে নবযুগের কথা বলা হয়েছে, এ যুগ সকল মানুষকে নিয়ে। মানুষকে যে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে রাখে সেই অন্ধকাররাত্রি অবসানপ্রায় আর নবযুগের প্রভাত আসন্ন এ কথা আমার মনে হয়েছিল, সেই ভাবের আবেগে এই কবিতাগুলি লেখা। মনে হতে পারে বুঝি লাইন মিলিয়ে কতকগুলি কবিতা লেখবার উদ্যোগেই এগুলি লেখা হয়েছে, কিন্তু তা নয়, আমার ভিতরে একটা তাগিদ এসেছিল তারই প্রেরণায় এগুলি রচিত হয়। অনেক সময়ে কোনো কোনো রচনাকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রকাশ বলে আপাতত মনে হয়, পরে দেখা যায় তা ঠিক নয়। ভিতরে ভিতরে একটা বিশ্বব্যাপী সত্যের তাগিদ নানা ছলে নিজেকে প্রকাশের উপলক্ষ খোঁজে। নিজের জীবনের যে ঘটনাগুলি নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অঙ্গীভূত সেগুলোকে উপকরণরূপে ব্যবহার ক'রে মনের কোন্-একটা নিগূঢ় অনুভূতি নিজেকে ব্যক্ত করে।

'অন্তর্যামী' কবিতাতেও সেই কথাই বলেছি। তাতে লিখেছি যে, হাটে যাবার সংকল্প করে রাস্তায় বেরিয়েছিলুম, শেষে দেখি নিজের অগোচরে সেই সংকল্প কোন্-এক অজানার মধ্যে যাবার উপলক্ষ হয়ে উঠল। এ যেন তারহীন টেলিগ্রাফযন্ত্রে কান পেতে আছি ঘরের খবর পাবার জন্যে— হঠাৎ দেখি সেই ঘরের খবরকে ছাপিয়ে দিয়ে একটা আকাশের বার্তা এসে হাজির। বলাকার এই কবিতাগুলিকে সেই রকম কোনো-একটা উড়ো পথে কবির মনে পৃথিবীর কোন্-একটা গভীর বেদনার বার্তা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কবিতাপাঠ ॥ এই কবিতায় ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের কথা নেই কিন্তু এতে সমস্ত মানুষের সাধনার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতকে সন্ধান করবার জন্য পৃথিবী জুড়ে প্রলয়ব্যাপার চলছে। এক দল গত যুগের আইডিয়ালকে আঁকড়ে ধরে তাকেই বিশ্বাস করে পড়ে আছে। তারা পুরাকালকে আশ্রয় করেছে বলে যে তাদের বিপদ নেই তা নয়, ভাবীকালকে বাধা দিতে গিয়ে তাদেরও লড়তে হয়। কার্যতঃ কিছু না করলেও তারাই বেশি

লড়াই করে। তাই আজ যারা পূর্বকার ন্যাশানালিজমের ভাবকে আঁকড়ে রয়েছে তারাও ঘরছাড়া, তাদের আশ্রয় নেই। তারা স্বাজাত্যের অপদেবতার মন্দিরটাকে রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পূর্বতন ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ মানুষকে কম দুঃখ দেয় না। এই একটি দল ছাড়া আর-এক দল আছে যারা নবযুগের বাণী বহন করছে। তারা ঘরছাড়ার দল। নৈরাশ্যের তাড়নায় তারা বার হয় নি। আলোকের পথে তাদের অভিযান, বাধাবন্ধ ছিন্ন করে নূতন যুগের অভিমুখে তাদের অভিসারযাত্রা। সেই যাত্রার মুখে তাদের বিঘ্ন বিপদ রক্তপাত সহ্য করতে হয়েছে।

যারা তামসিকতায় জড়িত হয়ে পূর্বের সংস্কারকে বিশ্বাস করছে তারা ভুলে যায় যে অনেক আগে তাদেরও এই ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে একটা স্থিতির মধ্যে আসতে হয়েছে। তারা মনে করে যে তারা সত্যের চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে, এই চিরকেলে পথেই মঙ্গল হবে, তাই অন্যকে তারা বাধা দেয়। একটি ভৌগোলিক উপদেবতার কাছে তারা নরবলি দিয়েছে, তারা মানুষের নারায়ণকে অবজ্ঞা করছে। এই স্বাজাত্যাভিমানীদের সঙ্গে নবযুগের দলের বিরোধ চলছে। যারা উদার ও সর্বজনীন আইডিয়ালকে বিশ্বাস করে তারা আজ দুঃখ পাচ্ছে, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করছে। কিন্তু তাদের এই নিন্দা দুঃখ অপমানের ভিতর দিয়ে আপন বিশ্বাসকে অবিচলিত রেখে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

এই ভাবটিই আমার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে এসেছিল এবং আমার এই কবিতায় তা প্রকাশ করতে চেয়েছি। দেশের যে গণ্ডীর ভিতরে আশ্রয় লাভ করে আমরা তাকে ঘর মনে করেছিলাম, সেই সীমারেখা ত্যাগ করে যারা ঘরছাড়া হয়েছে তারাই ভবিষ্যতের মহা যুগের যাত্রী; সম্মুখের বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে তাদের অগ্রসর হতে হবে।

৪ তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে

মানুষকে মিলিত করবার, নবযুগকে আহ্বান করবার, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধুলায় পড়ে রয়েছে। একে গ্রহণ করবার মধ্যে অনেক দুঃখ আছে।

ব্যক্তিগত যে কথাটুকু এই কবিতার মধ্যে আছে, তাকে ছাড়িয়ে আমি যে ভাবটা প্রকাশ করতে চেয়েছি তা এই—

একটা সময় এসেছিল যখন বেদনার আঘাতে মনে হয়েছিল, জীবনের কাজ তো সারা হয়ে গেছে, এখন পূজা অর্চনার দ্বারা শান্তি পাবার সময় এসেছে, এখন অন্য কোনো কাজের দাবি নেই। সে সময়ে এই পূজাকেই তখনকার একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবি এল, হঠাৎ মনে হল মানুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ তো বাজাতে হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোটো গণ্ডী থেকে বড়ো রাস্তায় তো ডাকতে হবে। এখন বললে চলবে না যে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাই। আমার আরত্রিক পূজার কি সময় আছে? তবে কি জীবনের সন্ধ্যায় রজনীগন্ধার শুভ্র স্নিগ্ধ বিকাশ হবে না? তবে কি এখন রক্তজবার মালা চাই? মনে করলেম বুঝি জীবনের শেষ বোঝাপড়া এবার করে নিতে হবে, কিন্তু নীরব শঙ্খ আমায় ইঙ্গিত করলে মানুষকে কোন্ বিরাট যজ্ঞে ডাক দেবার জন্য তাকে ধ্বনিত করতে হবে!

আলোচনা॥ এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনও যুদ্ধ শুরু হতে দু মাস বাকি আছে। তার পর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঔদ্ধত্যে হউক, ভয়ে হউক নির্ভয়ে হউক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বারস্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনো আরম্ভ হয় নি। আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে, তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমা রোলাঁ, বাট্রাণ্ড্ রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সার্ব-জাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই! পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায় এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

আমি কিছুদিন থেকে এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের এই যুগ সমস্ত

মানবের পক্ষে এক মহাযুগ, পৃথিবীতে এমন সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসে নি। একটা ভাবী কাল আসছে যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে। মন্থনে যেমন নবনী ভেসে ওঠে তেমনি বিশ্বের বিধাতার জগৎব্যাপী মন্থন-ব্যাপারে সাধকেরা উঠে পড়েছেন। এই বিবাগির দলের বেরিয়ে পড়ার প্রয়োজন ছিল। বিধাতা এমনি করে ঠেলা মেরে এঁদের বার করে দেন, এঁরা সংকীর্ণ পরিবেষ্টন থেকে সরে গিয়ে মুক্তিলাভ করেন।

পুরাণের কাহিনীতে আছে যে দেবাসুরের মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল রাহু কেতু তা পাবার জন্য চেষ্টা করেছিল, অযোগ্যেরা অমৃতে ভাগ বসাতে চেয়েছিল, অমৃত চুরি করতে চেয়েছিল। প্রাচীন কালের সে লোভ এখনো রয়েছে, এখনো স্বার্থের ভোগে লাগাবার জন্য লুব্ধ মন অমৃতকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করবে। লীগ অফ নেশনে যে সার্বজাতিক উদ্যোগ হচ্ছে, বিশ্বের রাহু কেতুরা তার আইডিয়ালিজ্‌ম্‌কে নিজের ভাগে নেবার জন্য বসে আছে। এমনি করে মহাযুদ্ধের সময়ে স্বার্থের জন্য যারা লড়েছিল তারা তাকে ধর্মযুদ্ধের আখ্যা দিয়ে কথার ছলনা করেছিল। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা যখন ভঙ্গ করা হল তখন যেমন যুবকের দল তাকে রক্ষা করতে অস্ত্রধারণ করেছিল, তেমনি বুড়ো রাষ্ট্রনীতিকের দল স্বার্থসাধনের হিসাব কষে এতে যোগদান করেছিল।

যে বিশ্বব্যাপী প্রলয় মানবের চিত্তসাগরকে মথিত করেছে তাতে এই দুই বিরুদ্ধ দলের উদ্ভব হয়েছে। অমৃত গরল দুইই উত্থিত হচ্ছে। এই বিষ মানুষের বড়ো পাপকে বৃহৎ আকারে দেখিয়ে দেবে। দেবতাদের ভোগের অমৃত নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে, স্বাজাত্যের স্বার্থকে বাড়াবার জন্য চেষ্টা হবে; কিন্তু শেষে অসুরের দলই পরাজিত হবে, জয় হবে দেবতাদের, আর শিব আসবেন সমস্ত হলাহল নিঃশেষিত করতে।

আমাদের অনুভব করতে হবে যে বিধাতা ছোটো জায়গার মধ্যে কাজ করেন না। একটা বিরাট বিশ্বব্যাপার চলছে, পৃথিবী জুড়ে দৈত্যসুরে মন্থন চলছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবর্ষের আমরা কোন্ দিক ধরি? দেবতাদের দিক না দৈত্যের দিক? কিন্তু যে পক্ষই ধরি তাতে কিছু আসে যায় না। দেবতা যারা তারাই মন্থনশেষে অমৃত পাবার অধিকারী হবে। যারা গৃধ্নুতার বশে লালায়িত হয়ে ভোগ করবার জন্য ছুটবে তাদের ভাগ্যে অমৃত নেই।

কবি নিজের কবিতা যখন ব্যাখ্যা করে তখন তার কথারই যে প্রামাণ্য আছে তা নয়, কবিতা লেখা হয়ে গেলে সে অন্য পাঠকদের সমশ্রেণীয়। সে কেবল তার হৃদয়াবেগের ইতিহাসটার কথা বলতে পারে, কারণ রচনাকালের সমস্ত আনুষঙ্গিকতার সেই সব চেয়ে বড়ো সাক্ষী। কিন্তু কবিতার মর্মগত অর্থ অপরেরও আবিষ্কার করবার ও ব্যাখ্যা করবার অধিকার আছে।

'বলাকা' রচনাকালে যে ভাব আমাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল এখনো সেই ভাব আমার মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করছি। বুকের মাঝে যে আলোড়ন হল তার কি সার্বজাতিক অভিপ্রায় আছে তা আমি ধরতে চেষ্টা করেছি। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময়ে সে চিন্তা আমার মনে বর্তমান ছিল। আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি, একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি, সে ডাককে কেউ মেনেছে কেউ মানে নি। 'বলাকা'য় আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

৫ মত্তসাগর দিল পাড়ি

এই কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে লেখা। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যখন কোনো কবিতা মনেতে আকার ধারণ করে তখন তা কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাকে অনুসরণ করে না। যখন কোনো-একটি ভাবের বীজ চিত্তক্ষেত্রে এসে পড়ে তখন তা ভিতরে গিয়ে আপনা হতে অঙ্কুরিত হয় এবং মানবপ্রকৃতির কতকগুলি খাদ্য পেয়ে সেই অঙ্কুর বিশেষ আকার গ্রহণ করে। তখন ভেবে ভেবে লিখে কবিতাকে আকার দেবার দরকার হয় না। কোনো দার্শনিক তত্ত্বের যেমন ব্যাখ্যা হয় তেমন করে এই কবিতাকে যথার্থভাবে বোঝানো কঠিন ব্যাপার। কোনো গাছ বিশেষ বীজ থেকে যে বিশেষ আকার পরিগ্রহ করে, তার সেই বিশেষত্বের মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্য আছে, কিন্তু সেই গোপন প্রক্রিয়াটি আমাদের জানা নেই।

সে সময়ে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার চিন্তা আমার মনে কাজ করছিল।

তাকে আমার চিত্ত এইভাবে দেখেছে— যুদ্ধের সমুদ্র পার হয়ে নাবিক আসছেন, ঝড়ে তাঁর নৌকার পাল তুলে দিয়ে। তিনি প্রমত্ত সাগর বেয়ে এই দুর্দিনে কেন আসছেন? কোন্ বড়ো সম্পদ নিয়ে এবং কার জন্য তিনি আসছেন? এই কবিতায় দুটি প্রশ্নের কথা আমি বলেছি। নাবিক যে সম্পদ নিয়ে আসছেন তা কী এবং নাবিক কোন্ ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন? যুদ্ধের সাগর যিনি পার হয়ে আসছেন তিনি কোন্ দেশে কার হাতে তাঁর সম্পদকে দান করবেন?

প্রথম স্তবক ॥ যখন চারি দিকে গভীর রাত্রি, সাগর মত্ত, ঝড় বইছে, এমন দুর্দিনে নাবিকের কী ভাবনা ছিল যে এমন সময়ে তিনি কূল ছাড়লেন? কী সংকল্প তাঁর মনে ছিল যার জন্য পরম দুর্দিনে নিয়মের দ্বারা সংযত লোকসমাজের কূলকে ত্যাগ করে তিনি মত্তসাগর পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়েছেন?

দ্বিতীয় শ্লোকে [স্তবকে] এই প্রশ্নের উত্তরের আভাস আছে। সেই আভাসটা এই যে, কোনো-একটি গৌরবহীনা পূজারিনি এক জায়গায় অজানা অঙ্গনে পূজার দীপ জ্বালিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, যুদ্ধের সাগর পার হয়ে নাবিক সেই পূজা গ্রহণ করবার জন্যে এই প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ছেড়েছেন। যে অঙ্গনে কারও দৃষ্টি পড়ে না, সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু তাঁকে আসতে হলে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আসতে হবে।

ঝড়ের মধ্যে এই বিবাগির, ঘরছাড়ার, এ কী সন্ধান এবং কাকে সন্ধান? কত না জানি মণিমাণিক্যের বোঝা নিয়ে তিনি নৌকা বেয়ে আসছেন! বুঝি কোনো বড়ো রাজ্‌ধানীতে তিনি ধনসম্পদ নিয়ে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু নাবিকের হাতে যে দেখি একটি মাত্র রজনীগন্ধার মঞ্জরী। তিনি যাঁকে খুঁজছেন তাঁকে তো তবে মণিমাণিক্য দেবেন না। তিনি অজ্ঞাত অঙ্গনে এক বিরহিণী অগৌরবার কাছে সেই মঞ্জরী নিয়ে আসছেন। এরই জন্য এত কাণ্ড? হাঁ, এরই জন্য নাবিকের নিষ্ক্রমণ।

যে রজনীগন্ধার সৌরভ অন্ধকারেই বিস্তৃত হয়, তা সেই অচেনা অঙ্গনের উপযুক্ত। দিনের বেলা সেই সৌরভ সঙ্গোপনে থাকে কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার সৌন্দর্যের প্রকাশ। সেই সৌরভময় ফুল নিয়ে নাবিক বেরিয়েছেন। নূতন প্রভাত আসন্ন, সেই নবপ্রভাতের উপহার নিয়ে নবীন যিনি তিনি আসছেন। যে তপস্বিনী পথের পাশে নূতন প্রভাতে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে

অপেক্ষা করছে তাকে সমাদরের মালা পরিয়ে দিতে তিনি বার হয়েছেন। সে রাজপথের পাশে রয়েছে, তার লোককে দেখাবার মতো ঘরদুয়ার নেই—তারই জন্য নাবিক অসময়ে সকলের অগোচরে বার হয়েছেন। সেই তপস্বিনীর রুক্ষ অলক উড়ছে, চক্ষের পলক সিক্ত হয়েছে, তার ঘরের ভিত ভেঙে গেছে, সেই ভিতের ভিতর দিয়ে বাতাস হেঁকে চলেছে। বর্ষার বাতাসে তার প্রদীপ কম্পিত হচ্ছে, ঘরের মধ্যে ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে। তার দৈন্যদশার মধ্যে ভয়ে ভয়ে সে রাত কাটাচ্ছে, তার আশঙ্কা হচ্ছে যে বর্ষার বাতাসে তার কম্পমান দীপশিখা কখন নিবে যাবে। সে এক প্রান্তে বসে আছে, তার নাম কেউ জানে না। কিন্তু তারই কাছে নাবিক আসছেন।

আমার উৎকণ্ঠিত নাবিক আজকের দিনেই যে বার হয়েছেন তা নয়। কত শতাব্দী হল তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে, কত দিন থেকে কত কালসমুদ্র পার হয়ে তিনি আসছেন। এখনো রাত্রির অবসান হয় নি, প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। যখন তিনি আসবেন তখন কোনো সমারোহ হবে না, তাঁর আগমন কেউ জানতেই পারবে না। তিনি আস্‌লে অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোকে ঘর ভরে যাবে। নূতন সম্পদ কিছু পাওয়া যাবে না, কেবল দৈন্য ঘুচে যাবে। তপস্বিনী যে দারিদ্র্য বহন করছিল তা ধন্য হয়ে উঠবে, শূন্য পাত্র পূর্ণ হয়ে যাবে। তার মনে অনেক দিন ধরে সন্দেহ জাগছিল, সে ভাবছিল যে তার প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করা ব্যর্থ হল বুঝি, কিন্তু তার সে সংশয় ঘুচে যাবে। তখন তর্কের উত্তর ভাষায় মিলবে না, সে প্রশ্নের মীমাংসা নীরবে হয়ে যাবে

ইতিহাসের বড়ো বড়ো বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ইতিহাসবিধাতা সাগর পার হয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসছেন। সেই মাল্য কে পাবে? আজ যারা বলিষ্ঠ শক্তিমান, ধনী, তাদের জন্য আসছেন না। তারা যে ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত; কিন্তু তিনি তো ধনরত্নের বোঝা নিয়ে আসছেন না। তিনি প্রেমের শান্তি বহন করে, সৌন্দর্যের মালা হাতে করে আসছেন। আজ তো শক্তিমানেরা সে মাল্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই, তারা যে রাজশক্তি চেয়েছে। কিন্তু যে অচেনা তপস্বিনী আপন অঙ্গনে বসে পূজা করছে আমার নাবিক রজনীগন্ধার মালা তারই জন্য নিয়ে আসছেন। সে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাচ্ছে, মনে করছে তার অজ্ঞাত অঙ্গনে পথিকের বুঝি পদচিহ্ন পড়ল না।

সে যখন মাল্যোপহার পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে তখন সে বলবে, 'তোমার হাতের প্রেমের মালা চেয়েছিলাম, এর বেশি কিছু আমি আকাঙ্ক্ষা করি নি। ধন-ধান্যে আমার স্পৃহা ছিল না।' এই রিক্ততার সাধনা যে করেছে, এই কথা যে বলতে পেরেছে, সে দুর্বল অপরিচিত দরিদ্র হোক, নাবিক সেই অকিঞ্চনের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন। এরই জন্য এত কাণ্ড, এত যুগ-যুগান্তরের অভিসার! হাঁ, এরই জন্য। সকল ইতিহাসের এটাই অন্তর্নিহিত বাণী।

গত মহাযুদ্ধে এক দল লোক অপেক্ষা করে বসে ছিল যে যুদ্ধাবসানে তারা শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আর-এক দল লোক পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল; তারা অখ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম কাণ্ডকারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর ও চরম সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছে, বিশ্বাস করেছে। বিশ্বে যারা পরাজিত, অপমানিত, তারা মনুষ্যত্বের চরম দানের পথ চেয়েই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গলের আদর্শের বিপরীত পথে চলেছে; কিন্তু তবুও তারা প্রদীপ যদি না নেবায়, তপস্যায় যদি ক্ষান্ত না হয়, অপেক্ষা যদি করে থাকে, তবে তখন সেই নাবিক এসে তাদের ঘাটে তরী লাগাবেন আর তাদের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেবেন।

৬ তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা

প্রথম স্তবক ॥ ঐ-যে আকাশের নক্ষত্র ছায়াপথে একত্র নীড় রচনা করে রয়েছে, ঐ-যে গ্রহ উপগ্রহ সূর্য চন্দ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো হাতে তীর্থযাত্রায় চলেছে, তুমি কি তাদের মতো সত্য নও? আজ কি তুমি কেবল চিত্ররূপে রয়েছ? ছবি দেখে অন্তরে এই প্রশ্ন উদিত হল।

দ্বিতীয় স্তবক ॥ জগতের যা-কিছু সবই চলার পথে রয়েছে, তুমিই কি কেবল চির-চঞ্চলের মাঝখানে শান্ত নির্বিকার হয়ে থাকবে? জগৎযাত্রার পথে যে-সব পথিক বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে কি তোমার যোগ নেই? তুমি সকল পথিকের মাঝখানেই আছ, অথচ তাদের থেকে দূরে আছ; তারা চঞ্চলতায় গতি পেয়েছে, তুমি স্তব্ধতায় বদ্ধ।

এই যে ধরণীর ধূলি, এ অতি তুচ্ছ, কিন্তু এও ধরণীর বস্ত্রাঞ্চলরূপে বাতাসে

উড়ছে। এই ধূলিরও কত বিকার, কত পরিবর্তন। বৈশাখে যখন ফুল ফোটে না, শুকিয়ে ঝরে যায়, যখন ধরণী বিধবার মতো তার আভরণ ত্যাগ করে, তখন সেই তপস্বিনীকে এই ধূলি গৈরিক বস্ত্র পরিয়ে দেয়। আবার যখন বসন্তের মিলন-উষা আসে তখন সে ধরণীর গায়ে পত্রলিখা এঁকে দেয়। এই-যে তৃণ বিশ্বের পায়ের তলে আছে এরা অস্থির, এরাও অঙ্কুরিত দোলায়িত হচ্ছে, উজ্জ্বল হচ্ছে, ম্লান হচ্ছে। এদের মধ্যে নানা বিকাশ ও পরিবর্তন আছে বলেই এরা সত্য। তুমিই কেবল ছবি, বরাবর এক ভাবে স্তব্ধ হয়ে আছ।

তৃতীয় স্তবক॥ আজ তুমি ছবিতে আবদ্ধ আছ বটে, কিন্তু তুমিও তো একদিন পথে চলতে। নিশ্বাসে তোমার বক্ষ দোদুল্যমান হত। তোমার প্রাণ তোমার চলায় ফেরায় সুখে দুঃখে কত নূতন নূতন ছন্দ রচনা করেছে। বিশ্বের ছন্দে প্রাণের ছন্দ তাল রক্ষা করে লীলায়িত হয়েছে। সে আজ কত দিনের কথা! তখন আমার নিজের জগৎ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যে জগৎ বিশেষরূপে আমারই, তাতে তুমি কত গভীররূপে সত্য ছিলে! এই জগতে সুন্দর জিনিস যা-কিছু আমি ভালোবেসেছি তার মধ্যে তোমার নিজের নামটি তুমি যেন লিখে দিয়েছিলে। তুমি নিখিলকে রসময় করে তুলেছিলে, তোমার মাধুর্যের তুলিতে বিশ্ব সুন্দর মধুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তার আনন্দময় বার্তাকে তুমি মূর্তিমতী বাণীরূপে আমার কাছে বহন করে এনেছিলে।

চতুর্থ স্তবক॥ আমরা দুজনে এক সঙ্গে চলেছিলাম, হঠাৎ অনন্তরাত্রি তোমাকে অন্তরালে নিয়ে গেল। আমি চলতে লাগলাম, তুমি নিশ্চল হয়ে গেলে। দিন ও রাত্রি আমার সুখদুঃখ বহন করে নিয়ে চলল, আমার চলা আর থামল না। আকাশের সাগরে আলো-অন্ধকারের জোয়ার-ভাঁটার পালা চলেছে। আমি পথ দিয়ে যাত্রা করেছি, সেই পথের দু ধারে ফুলের দল চলেছে— কদম্ব শিউলি নাগেশ্বর করবী, নানা ঋতুতে এদের উৎসবের যাত্রা। আমার দুরন্ত জীবননির্ঝর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছুটেছে; অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত ধ্বংস হতে হতেই প্রাণের পথ তারা কেটে দিচ্ছে। তাই মৃত্যুই কিঙ্কিণী বাজিয়ে জীবনকে শব্দিত করছে, নানা দিকে প্রসারিত করে দিচ্ছে। আজ জানি না কাল কী হবে, পরক্ষণে কী ঘটবে— অজানা তার বাঁশি বাজিয়ে আমাকে দূর থেকে দূরে ডেকে ডেকে চলেছে। আমি প্রতিদিনের চলাকে

ভালোবাসি বলেই জীবনকে ভালোবাসি। অজানার সুরে চলা আমার ভালো লাগে। তুমি আমার সঙ্গে চলেছিলে, হঠাৎ একেবারে পথ থেকে নেমে গেলে। আমরা ক্রমাগত চলেছি; হঠাৎ তুমি এক জায়গায় দাঁড়ালে, সেখানেই স্তম্ভিত হয়ে ছবি হয়ে রইলে।

পঞ্চম স্তবক ॥ আমার হঠাৎ মনে হল, এ কী প্রলাপ বকছি? তুমি কি কেবল ছবি? না, না, তুমি তো শুধু তাই নও। কে বলে তুমি কেবল রেখার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে রয়েছ? তোমার মধ্যে যে সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশিত হয়েছিল ও মূর্তি গ্রহণ করেছিল, তা যদি এখনও না থাকত তবে এই নদীর আনন্দবেগ থাকত না। তোমার আনন্দ যে বাণীকে বহন করে এনেছিল তা তো থামে নি। বিশ্বের যে অন্তরের বার্তাকে তুমি এনেছিলে, তা চিরকাল ধরে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। তা যদি না হত, তবে মেঘের এই স্বর্ণচিহ্ন থাকত না। তোমার যে চিক্কণ কেশের ছায়া তা বিশ্বের নানা রূপের মধ্যে রয়েছে, তা যদি বিশ্ব থেকে মিলিয়ে যেত তবে সৃষ্টির আনন্দের মধ্যেই ক্ষতি হত, সেই সঙ্গে মাধবীবনের মর্মরায়মাণ ছায়া লুপ্ত হয়ে স্বপ্নপ্রায় হয়ে যেত।

তুমি আমার সামনে নেই, কিন্তু জীবনের মূলে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আছ, তুমি আর পৃথক হয়ে থাকলে না। তোমাকে আমি যে ভুলেছিলুম, সে ভুল বাইরের। তুমি আমার জীবনের চৈতন্যলোক থেকে মগ্নচৈতন্যের জীবনে চলে গেছ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আমার অন্তরের গভীর দেশে গেছ। আকাশের তারা রাত্রিকে বেষ্টন করে আছে, আমরা কত সময়ই তাদের কথা সচেতন ভাবে ভাবি না, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে চলার মধ্যে তাদের দিকে না চেয়ে দেখলেও তাদের সংগীত ও আনন্দে আমাদের মন অলক্ষ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। তেমনি পথে চলতে চলতে ভাবছি যে ফুলকে ভুলেছি, কারণ সচেতন ভাবে তাকে চোখে দেখছি না। কিন্তু আমার যাত্রাপথে সেই ফুল প্রাণের নিশ্বাসবায়ুকে সুমধুর করছে, ভুলের শূন্যতাকে পূর্ণ করছে। আমি ভুলি বটে, তবুও ভুলি না।

আমি তোমাকে বিশেষভাবে মানসচক্ষে দেখছি না বলে যে ভুলে রয়েছি তা নয়। বিস্মৃতির কেন্দ্রস্থলে বসে তুমি আমার রক্তেতে দোল দিয়েছ। তুমি চোখের বাইরে নেই, ভিতরে সঞ্চিত হয়ে আছ। সেইজন্যই আজকের বসুন্ধরার

শ্যামলতার মধ্যে তোমার শ্যামলতা, আকাশের নীলিমার মধ্যে তোমার নীলিমা দেখছি। তুমি যে আনন্দ দিচ্ছ বিশ্বের আনন্দের মধ্যে তা মিলিয়ে আছে।

আমি যখন গান গাই, তখন কেউ জানে না যে, তোমার সুর ভিতরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তুমি কবির বাইরে ছিলে, কিন্তু অন্তরের যে কবি সংগীত-কাব্য রচনা করছে তার প্রেরণা রূপে তুমি আজ মর্মস্থলে রয়েছ। তুমি কবির অন্তরে কবি হয়ে রইলে, আর বাইরের নিখিলে ব্যাপ্ত হয়ে থাকলে। তুমি শুধু ছবি নও।

তোমাকে একদিন সকালে লাভ করেছিলুম; তার পর রাত্রি এল, তুমি অন্তরালে চলে গেলে। রাত্রিতে তোমাকে হারিয়ে ফেলে, রজনীর অন্ধকারের মধ্যেই গভীরভাবে তোমাকে আবার ফিরে পেলাম।

১৪ কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে

এই আনন্দ-ছবি যুগযুগান্তর প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তা বিকশিত হল। যে সত্য অপ্রকাশিত ছিল, আজ তা রূপ ধরে ফুটে উঠেছে। বহিঃপ্রকৃতিতে এই মাধবীর বিকাশ যেমন সত্য তেমনি আজ আমার মনে যে আনন্দ জাগ্রত হল, যে ভাবের বিকাশ হল, সেও তেমনি সত্য। একটি আমার বাহিরে এবং অন্যটি আমার অন্তরে, তাই বলে তারা পরস্পরের তুলনায় কেউ বা বেশি কেউ বা কম সত্য তা নয়।

মানুষের যে আনন্দধারা আমি কবিতায় প্রকাশ করলাম তা তো একান্ত-ভাবে আমারই কল্পনা থেকে উদ্ভূত নয়। শিল্পী কাব্যে ও চিত্রে যে সৌন্দর্যকে রূপদান করে, যে আনন্দকে ফুটিয়ে তোলে, তা তো সেই রসমাধুর্য যা মানুষের কত প্রেমে অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিল। মানুষের সেই অব্যক্ত উদ্যম কবি বা শিল্পীর রচনায় রচিত হয়ে ওঠে। এই রচিত হয়ে ওঠবার তপস্যা গূঢ়ভাবে সকল মানুষের মনের ভিতরে আছে। সকল মানুষেরই মন আপনার বিচিত্র ভাবোদ্যমকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা করছে। সেই সকলের ইচ্ছা ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে রূপ লাভ করে সফল হয়ে উঠছে। আমাদের মনে যে-সকল ইচ্ছার উদ্যম, আনন্দের উদ্যম, অন্তর্গূঢ় হয়ে আন্দোলিত হচ্ছে তারাই হচ্ছে মানুষের সকল সৃষ্টির মূলশক্তি। তারাই চিত্রীর তুলিকায়, কবির লেখনীতে, মূর্তিকরের ক্ষোদনীযন্ত্রে কেমন করে প্রকাশিত হতে থাকে।

অনেক সময়ে 'বসন্ত কাননের একটুকু হাসি' আমাদের মনে যে আনন্দ জাগিয়ে দিয়ে যায়, মনে হয়, হয়তো এ কোনোদিন বাহিরে কিছুতে বিকশিত হয়ে উঠবে না ; কিন্তু মনে আশা আছে যে তা ব্যর্থ হয়ে যায় না। রোহিত-সাগর দিয়ে যেতে যেতে আমি একবার আশ্চর্য সূর্যাস্ত দেখেছিলুম। তখন মনে হয়েছিল যে এই অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সমাবেশকে তো ধরে রাখতে পারলুম না, ভাবলুম যে এই-যে বাইরের প্রকৃতির রূপের উচ্ছ্বাস আমার মনে ছায়া দিয়ে চলে গেল সে ছায়াও তো মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এই-যে অমৃতমুহূর্তে সৌন্দর্যে ডুব দিলুম, এর শেষ পরিণতি অপ্রকাশের বেদনার মধ্যে নয়— এই অনুভূতি আমার অন্তরলোকে আপন জায়গা করে নিলে। সেই আমার অন্তরলোক সকল মানুষের অন্তরলোকের সামিল। সেইখানে এই সমস্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ ও লয়— আকাশে মেঘের প্রকাশ ও লয়, অরণ্যে মাধবীর বিকাশ ও ঝরে পড়ার মতোই সৃষ্টিলীলা। এই লীলার আন্দোলন হচ্ছে বাহির থেকে অন্তরে, আবার অন্তর থেকে বাহিরে। আজ আমার চিত্তে যে আনন্দ দেখা দিয়েছে সে যদিও আমার চিত্তের মধ্যেই আছে তবু তার মধ্যে একটি বেরিয়ে আসবার প্রয়াস আছে। তাই সে ধাক্কা দিচ্ছে রুদ্ধ দ্বারে। সমস্ত মানুষের মন জুড়ে এই ধাক্কাটি নিরন্তর চলছে। সেই ধাক্কাটি হচ্ছে বেরিয়ে আসবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা নানা উপলক্ষে জাগ্রত হচ্ছে বলেই মানবসমাজে সৃষ্টির কাজ চলছে। এর প্রেরণা, ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো আবশ্যকের প্রেরণা নয় ; কেবলমাত্র প্রকাশের প্রেরণা। অতএব, রোহিতসমুদ্রে আকাশের যে বর্ণভঙ্গিমা আমার মনের মধ্যে একদিন আনন্দের ঢেউ হয়ে উঠেছিল সেই ঢেউ নিশ্চয় আমার রচনার সাধনায় বারবার ঠেলা দিয়েছে। আজ বসন্তে বাইরের যে মাধবীমঞ্জরী আমার অন্তরে আনন্দরূপ নিয়েছে সে আমার মনের সাধারণ প্রকাশচেষ্টার মধ্যে একটি শক্তিরূপে রয়ে গেল— আমার নানা গানের নানা সুরে তার দোলা লাগবে— আমি কি তা জানতে পারব ?

১৬ বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি

প্রথম স্তবক ॥ চারি দিকে বিশ্বের বস্তুরাশি যেন হাহা করে হেসে উঠেছে। ধুলোতে বালিতে তাদের করতালি হচ্ছে, তারা উন্মত্তভাবে নৃত্য করছে।

বস্তুর সংঘাতে বস্তুর যে লীলা হচ্ছে, যেন তারই কোলাহল শোনা যাচ্ছে। চারি দিকে রূপের মত্ততা। রূপ বস্তুর আকারে গতি পেয়েছে, তার সংগীত শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় স্তবক॥ চারি দিকে বস্তুপুঞ্জ সত্তা ধারণ করে প্রকাশের মত্ততায় মেতে উঠেছে, তাই দেখে আমার মন তাদের খেলার সাথি হতে চায়। বস্তুর দল আমার ভাবনা কামনাকে বলছে, 'আমাদের খেলার সঙ্গী হও— লক্ষ-গোচর হও, ধুলাবালির মধ্যে রূপ ধারণ করো।'

মানুষের যে অব্যক্ত স্বপ্নের দল তারা যেন কূল পেলে বেঁচে যায়। তারা অপ্রকাশকে পেরিয়ে বস্তুর ডাঙায় সৃষ্টির সঙ্গে মিলতে চায়। তারা যেন মজ্জমান প্রাণীর মতো অতলের নীচে থেকে ইটকাঠের মুষ্টি দিয়ে ধরণী আঁকড়ে ডাঙায় উঠতে চায়।

এমনি করে মানুষের চিত্তের চিন্তাগুলি বাইরে কঠিন আকার ধারণ করছে। মানুষের শহরগুলি আর কিছু নয়, তারা মানুষের সেই ভাবনা ও কামনারই ব্যক্ত প্রকাশ। কোনো শহর কেবল কতকগুলি বাড়ির সমষ্টি নয়। মানুষের যে স্পর্শাতীত প্ল্যান, চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা, রূপজগতে সুস্পষ্ট হতে চাচ্ছে, তারাই যেন লোহা-লক্কড়ের ভিতর দিয়ে এই শহরে স্পর্শগোচর হয়েছে। দিল্লিনগরীতে কত সম্রাট এসেছে, আবার তারা চলে গেছে, মরে গেছে; কিন্তু দিল্লিতে তাদের ভাবনা, ইচ্ছা, প্রতাপ, কালে কালে স্তরে স্তরে জমে উঠে ইটকাঠের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে এই মহানগরী তৈরি করে গেছে।

তৃতীয় স্তবক॥ যে-সকল চেষ্টা রূপ ধারণ করতে পারল তাদের তো আজ দেখছি, কিন্তু যেগুলি এখনো ব্যক্ত হয় নি তারাও যে রয়ে গেছে। অতীতের পূর্বপিতামহদের কামনা ধ্যান তপস্যা কি লুপ্ত হয়ে গেছে? না, তারা যে শূন্যে শূন্যে কানাকানি করে ফিরছে; তারা বলছে, 'আমাদের বাণী নেই, তোমাদের বাণী পেলে আপনাদের প্রকাশ করি। আমাদের কোনো আধার নেই, তোমাদের বাণী সেই আধার দেবে। আমরা যে অন্তরের কথা বলতে চাই, শ্রুত হতে চাই।' লোকালয়ের তীরে তীরে এমনি কত অশ্রুত বাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের হাতে আলো নেই, কিন্তু অতীতের সেই অব্যক্ত ইচ্ছা চেষ্টা বর্তমান কালের আলোর তীর্থে, প্রকাশের ঘাটে উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছে।

তারা সব পুরাকালের আলোকহীন যাত্রী, প্রকাশের ঘাটে উঠতে পারলে তারা বাঁচে।

তারা চিত্তগুহা ছেড়ে ছুটেছে, তারা রূপ পাবার আশায় অন্ধমরু পাড়ি দিয়ে চলেছে। তারা আকারের তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিরাকারকে আঘাত করছে। তারা কতদিন ধরে অব্যক্তমরু পার হবার জন্য যাত্রা করেছে; বলছে, 'কোথায় গেলে আকার পাই?'

চতুর্থ স্তবক॥ আমার ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগে, আমরা সবাই তাকে রূপ দিতে পারলাম না, কিন্তু তারা বেরিয়ে পড়েছে। কোন্ পারে কোন্ তপস্যায় গিয়ে তাদের গতি শেষ হবে! তারা সব পাড়ি দিয়েছে, কে কোন্ ঘাটে উঠবে জানে না; কিন্তু তারা জানে যে, একদিন তারা নূতন আলোতে বিকশিত হবে। কত যুগ-যুগান্তর থেকে মানুষের মনে প্রেমের জন্য, শান্তির জন্য, যে-সকল আকুল তৃষ্ণা জেগেছিল, তারা যুগে যুগে মানব-সমাজের নানা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কোনো-না-কোনো ব্যবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে। পুরাযুগের মানুষদের চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষার দল এক যুগের পাড়ি শেষ করে নবযুগে রূপের বন্দরে এসে ঠেকল। আজকের দিনে যে-সকল ব্যক্তিবিশেষ প্রচ্ছন্নতার ভিতরে থেকে কত গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তপস্যা করছে, তাদের অপূর্ণ কামনাগুলি পাড়ি দিয়ে বসেছে— হয়তো তারা কোনো ভাবীকালে অপূর্ব আলোতে প্রকাশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু কত পুরাতন দূরবর্তী অতীতের ইতিহাসে এদের জন্ম হয়েছিল তখন তা কেউ জানতে পারবে না। আজ তারা বাসাছাড়া পাখির দলের মতো মানসলোকের নীড় ত্যাগ করে ডানা মেলেছে। তারা যেদিন বাসায় পৌঁছবে, সেদিন কোন্ নীড় ত্যাগ করে তারা এসেছে তা কেউ জানবে না।

আমার ভাবনা কামনা নিয়ে কোন্-এক কবি যে কবিতা লিখবে, কোন্-এক চিত্রকর যে ছবি আঁকবে, কোন্-এক রাজপুরীতে যে হর্ম্য তৈরি হবে, আজ দেশে [কালে] তাদের কোনো চিহ্ন নেই। আজ সেই-সব অরচিত যজ্ঞভূমির উদ্দেশে বর্তমানের মানুষ ভাবীকালের দিকে মুখ করে তীর্থযাত্রীর মতো চলেছে। হয়তো কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রামের রণশৃঙ্গের ফুৎকারে আজকের-দিনে-আরব্ধ তপস্যার আহ্বান রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবে মানুষের যুগসঞ্চিত ইচ্ছা ও বেদনার আহ্বান ছিল, তাই তারা ডাক শুনতে পেয়ে সংগ্রামস্থলে

এসে পৌঁচেছিল। যে ইচ্ছা আজ ফললাভ করতে পারল না, ভাবীকালের কোন্ ভীষণ সংগ্রামে তাদের ডাক রয়েছে!

১৭ হে ভুবন আমি যতক্ষণ

প্রথম স্তবক॥ যতক্ষণ বিশ্বকে ভালোবাসি নি ততক্ষণ আমার জীবনে তার দান কিছু কম পড়েছিল। তখন তার আলোতে সব সম্পদ পূর্ণ হয় নি— কারণ যখন আলোর মধ্যে আনন্দকে দেখি তখনই আমার কাছে তার সার্থকতা আছে। আলো আছে বলেই গাছপালার অস্তিত্ব আছে কেবল এই ব্যাপারটি যখন আমার কাছে সপ্রমাণ হল তখনও তার আসল তাৎপর্য (significance) আমার কাছে সুস্পষ্ট হয় নি। কিন্তু যখন ভুবনের দিকে চেয়ে থেকে আনন্দের উদ্‌বোধন হল তখন যে আলো আমার মনের সঙ্গে মিলন সম্পাদন করল তার সত্য আমার কাছে প্রচ্ছন্ন রইল না। আমি যতক্ষণ ভুবনকে ভালোবাসি নি ততক্ষণ সমস্ত আকাশ দীপ হাতে চেয়েছিল— আমার আনন্দের দ্বারা তার আলোর সত্য পূর্ণতা লাভ করবে ব'লে। আকাশ সূর্য চন্দ্র তারার বাতি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করে আছে। কখন আমি প্রেমের আনন্দদৃষ্টি দিয়ে তার সত্যকে উপলব্ধি করব। সে বহু বৎসর ধরে দীপ জ্বালিয়ে এই আনন্দের অপেক্ষা করে আছে— কখন আমার জীবন তারার পূর্ণ সত্যকে পাবে।

দ্বিতীয় স্তবক॥ যে দিন প্রেম গান গেয়ে এল— তোমার সঙ্গে আমার মিলন হল, সে দিন কী যেন কানাকানি হল। ভুবনের সঙ্গে আমার পরিণয় হল, সে বললে— আমি তোমায় বরণ করলুম। আমার প্রেম বিশ্বের গলায় আপন মালা পরিয়ে দিয়ে হেসে দাঁড়াল। সে তার দিকে হেসে চাইল, তার পর একটা-কিছু দিল। যা গোপন বস্তু কিন্তু যা চিরদিনের জিনিস। সে তাকে সেই আনন্দসম্পদ দিয়ে গেল যা তার তারার আলোয় চিরদিনের মতো গাঁথা হয়ে রইল। এই সম্পদ উপহার পাবে বলেই ভুবন তারার দীপ জ্বালিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে পথ চেয়ে বসে ছিল— কবে আমার প্রেমের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হবে, সে এসে ভুবনের গলায় মালা পরিয়ে দেবে। তারার আলোর মধ্যে এই প্রতীক্ষা ছিল। যে দিন প্রেম এল সে দিন সে এমন-কিছু দিয়ে গেল যা ধ্রুবতারায় ধ্রুব হয়ে রইল, যা ভুবনকে পরিপূর্ণতা দান করল।

প্রথম স্তবক ॥ আমি যতক্ষণ স্থির হয়ে আছি ততক্ষণ বস্তুসমূহ ভারস্বরূপ হয়ে থাকে। তখন জীবনের বোঝা, সঞ্চয়, ধন, আমার পক্ষে দুর্বহ হয়। যখন আমার চলা বন্ধ হয়ে যায় তখন ধন জন যা-কিছু জমতে থাকে তা কিছুই চলে না, তারা আমাকে ঘিরে ফেলে। সেই সঞ্চয়কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমি জেগে আছি। বইয়ের পোকা যেমন তার পাতার মধ্যে বসে বসে তাদের কাটে আর খায়, তেমনি আমি এই জায়গায় বসে বসে কেবল খাচ্ছি আর জমাচ্ছি। আমার চোখে ঘুম নেই— মনের মাথায় বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে। দুঃখ নূতন নূতন হয়ে বেড়ে চলেছে, বোঝাই হয়ে উঠছে। আমি স্থির হয়ে আছি বলে সতর্ক বুদ্ধির ভারে, সংশয়ের শীতে, জীবনের চুল পেকে গেল ; সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় স্তবক ॥ আমি যেই চলতে শুরু করলেম অমনি মন তার মাথায় পিঠে যে বোঝা চারি দিক থেকে এঁটে দিয়েছিল, চলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে সংঘাতের দ্বারা তার আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল, ব্যথার সঞ্চয়ের ক্ষয় হল। চলার সংঘর্ষে, আনন্দের আবেগে, যে আবরণ জড়িয়ে ধরেছিল তা ক্ষয় হতে থাকে। মন মতামতের (opinionএর) দুর্গে বদ্ধ হয়ে বাঁধা আইডিয়ার মধ্যে থাকলে সে বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যা চলে না, স্থির হয়ে জমতে থাকে, তা মলিনতার আবর্জনা। মন যতই নূতন পরিবর্তনের মধ্যে চলছে ততই সে নব নব সম্পদে ভূষিত হচ্ছে। সনাতনের অচলতার দ্বারা মন নবীভূত (purified) হতে পারে না। চলার স্নানেই সকল বস্তু ধৌত নির্মল হয়ে যাচ্ছে। জরা জীবনকে যে পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন করে রাখে, জীবনের চলার প্রাণশক্তি (vigour) সেই সঞ্চিত স্তূপকে ফেলে এগিয়ে চলে। স্থবিরতা কেবলই পুরাতনকে আঁকড়ায়— সে বোঝা ফেলে দিয়ে হালকা হতে চায় না, তাই সে মলিন স্তূপের দ্বারা জড়িত হয়ে থাকে। এর থেকে বাঁচবার উপায় হচ্ছে মনকে নিত্যনবীন পথে চালনা করা। চলার আনন্দরস পান করে মনের যৌবন বিকশিত হয়।

তৃতীয় স্তবক ॥ আমি থামব না। আমি বলব না যে, 'আমার চলা সারা হয়ে গেল, সুতরাং এখন আমি যা সঞ্চয় করেছি তাই দিয়ে-থুয়ে আমি গৃহস্থ হয়ে বসলাম।' আমি যাত্রী, আমি সম্মুখপানে চলব। কে পিছন থেকে ডাকছে, আমি তার কথা শুনব না। আমি আর সঞ্চয়— স্থবিরতা— মৃত্যুর

গোপন প্রেমে ঘরের কোণে লুকাব না, আমি ঘর-ছাড়া হয়ে পথের পথিক হব। আমি চিরযৌবনকে মালা পরাব। ঐ-যে চিরযৌবন চলেছে পথিকের বেশে ; তাকে আমি আমার যা-কিছু নিজের রচনা, সৃষ্টি, নিজের যে-সব দেবার জিনিস, সমস্তই দেব। যে বার্ধক্য সঞ্চয়ের দুর্গে সতর্ক বুদ্ধির দেওয়ালে বন্ধ হয়ে বসে আছে তার আয়োজনকে আজ দূরে ফেলে দিয়ে আমি হালকা হয়ে চলব।

চতুর্থ স্তবক ॥ হে আমার মন, অনন্ত গগন যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ হয়ে গেছে। যে রথ তোমায় নিয়ে চলেছে বিশ্বকবি তার মধ্যে বসে আছেন। গ্রহতারারবি যাত্রার গান গাইতে গাইতে চলেছে। মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলার আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে।

১৯ আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে

আমি জগৎকে ভালো বেসেছি বলে এতে আমার আনন্দ আছে। আমি জীবন দিয়ে এই বিশ্বকে ঘিরে ঘিরে বেষ্টন করে রেখেছি। আমি বিশ্বের প্রভাত-সন্ধ্যায় আলো-অন্ধকারকে আমার চেতনা দিয়ে পূর্ণ করেছি— তারা আমার চৈতন্যের ধারার উপর দিয়ে ভেসে গেছে। আমি অনুভব করেছি যে, জীবন ভুবনের সঙ্গে মিলে গেছে, এরা তফাৎ নয়। আমি জীবনকে আলাদা ভালোবাসি না বলে আমার কাছে জগতের আলোকে ভালোবাসা মানেই আমার প্রাণকে ভালোবাসা। আমি জীবনকে কখনো জগৎ-ছাড়া দেখি না, তাই আমার ভয় হয় না পাছে জগতের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়। আমি যদি জগৎ থেকে দূরে কারারুদ্ধ হয়ে থাকতুম তবে এই অনুভূতি হয়তো থাকত না। কিন্তু আমি জগতে বাস করছি বলে আমার কাছে জীবন ও ভুবনের ভালোবাসা এক হয়ে আছে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জগৎ ও আমার চৈতন্য এক হয়ে গেছে ব'লে চৈতন্য-থেকে-বিরহিত জগৎটা আমার কাছে একটা abstraction। জীবন ও ভুবন যখন মিলিত হচ্ছে তখনই উভয়ে সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভ করছে।

দ্বিতীয় স্তবক ॥ এও যেমন একটা সত্য, তেমনি এই বস্তুবিশ্বে একদিন আমাকে মরতে হবে এই ব্যাপারটাও সত্য। এমন একদিন আসবে যখন আমার যে বাণী ফুলের মতো ফোটে, তা বাতাসের স্পর্শে ফুটে উঠবে

না। আমার চোখ প্রতিদিন আলো আহরণ করছে, কিন্তু সেই দিন আমার চোখের সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখন আমার হৃদয় অরুণোদয়ের আহ্বানে ছুটছে, সে দিন তা ছুটবে না। একদিন রজনী কানে কানে তার রহস্যবার্তা বলবে না— সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কাজ ফুরিয়ে যাবে। তাই পার্থিব জীবনের যে এমনি করে অবসান হবে এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

তৃতীয় স্তবক ॥ জগৎ জীবনকে এখন একান্ত করে চাচ্ছে। আলো-অন্ধকারের মধ্যে, প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে, সে কত করে জগৎকে চাচ্ছে এবং উভয়ের মিলনের দ্বারা এই চাওয়ার সার্থকতা হচ্ছে। এ সত্য ; তেমনি একদিন এই জগতের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, আমাকে মরতে হবে, সেও সত্য। তবে কি করে এই contradiction হতে পারে, এই দুই সত্যের মধ্যে কি মিল নেই ? যদি মিল না থাকে তবে জগৎকে যে চাইলুম, সে যে আমাকে ভোলালে, তা যে একটা মস্ত প্রবঞ্চনায় গিয়ে ঠেকল। বিশ্বের সঙ্গে জীবনের যে আনন্দসম্বন্ধ স্থাপিত হল তা যদি একদিন মিথ্যা হয়ে যায়, যদি এমন করে সব ছাড়তে হয়, তবে তো কোনো মানে থাকে না।

অথচ কোনো ক্রূরতা তো বিশ্বে বলীরেখা আঁকে নি। যদি বিশ্ব এতদিন এত বড়ো প্রবঞ্চনাকে বহন করে এসে থাকে, যদি মৃত্যুর নিরর্থকতায় সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তার কোনো চিহ্ন এই পৃথিবীতে কেন দেখছি না ? তা হলে তো বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য থাকত না। পুষ্পকে কীট কাটলে তা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যদি একটি মৃত্যুও সত্য হত তবে সব মৃত্যু বিশ্বে তার দংশনের চিহ্ন ফুটো রেখে দিয়ে যেত। তবে মৃত্যুকীট অনায়াসে পৃথিবীকে শুকিয়ে কালো করে দিত। অথচ কেন এই পৃথিবী সদ্য-ফোটা ফুলের মতো আমার সামনে রয়েছে ? এই সৌন্দর্যের emphasisএর মানেই হচ্ছে যে, মৃত্যুই সর্বগ্রাসী abyss নয়, মৃত্যুই চরম সত্য নয়। কারণ, যদি তাই হত তবে তার প্রত্যেক দংশন ভুবনকে ছিদ্রে আচ্ছন্ন করে কালো করে শুকিয়ে ফেলত।

আলোচনা ॥ ১ ॥ 'এমন একান্ত করে চাওয়া'— এমন করে যে জগৎকে চাচ্ছি আর এমন করে যে জগৎকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি এই দুটোই যদি সমান সত্য হয়েও দুটো contradictory হয় তবে জগতে এই ভয়ানক অসামঞ্জস্যের

ভার এই প্রবঞ্চনা থেকে যেত, তবে তার সৌন্দর্যের মধ্যে ক্রূরতার চিহ্ন দেখতাম। কিন্তু তা তো কোথাও দেখি না। তবে এই দুই সত্যের মিল কোথায়?

এর উত্তর এই কবিতায় নেই, কিন্তু সেটাকে এমনি ভাবে বলা যেতে পারে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন (renewal) হয় না। ('ফাল্গুনী'তে আমি এই কথাই বলেছি। 'ফাল্গুনী' বলাকা'র সমসাময়িক।) সীমাকে পদে পদে মরতে হয়, পুনঃপুনঃ প্রাণসঞ্চার না হলে সে যে জীবন্মৃত হয়ে রইল। রূপ (form) যদি স্থবির হয়, fluid জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয়, তবেই সেই অচলরূপেই তার সমাধি হল। মৃত্যু রূপকে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়। যদি তার জীবন এক জায়গায় থেমে রইল তবে তো তার প্রসারণশীলতা (elasticity) রইল না। ইতিহাসে তাই দেখতে পাই মানুষ যখন প্রথার গণ্ডীতে বদ্ধ হয়ে থাকার দরুন তার মনের প্রসারণশীলতা চলে গেল তখন আবার একটা নবযুগ তার বাণীকে বহন করে এনে সেই বন্ধন ছিন্ন করে দিল। অসীমের প্রকাশ (manifestation) সীমাতে হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যেই সীমার চরম অবসান নয়— মৃত্যু তার বিশিষ্ট রূপকে ভেঙে দিয়ে তাকে নব নব আকারে পুনরুজ্জীবিত করে। আনন্দ হচ্ছে জীবনের positive দিক, তার negative দিকটার কাজ হচ্ছে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তার প্রবাহকে পুনঃপ্রবর্তিত করা।

এই নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতির বোঝাকে যে বইতে হবে তা নয়। মানুষের জীবনের শৈশবকাল থেকে একটা ঐক্যধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে— বিস্মৃতির সিংহদ্বার দিয়ে সেই ধারাকে আসতে হয়েছে। আমাদের সচেতন জীবনের মধ্যেও কত বিস্মৃতির ফাঁক আছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ রয়েছে। যে সত্য আমার দেহে আবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তা আজ আমার চেতনার আলোয় বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই আলোরও মেয়াদ (term) আছে, এই বেড়ারও অবসান আছে।

এক-এক সময়ে ঠেলা আসে, তখন তার ধাক্কায় সব বিদীর্ণ হয়ে যায়। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের অবস্থানও ঠিক এই রকমের। সে যতক্ষণ পরিণতি লাভ করছে ততক্ষণ তার বৃদ্ধি সেই সীমাবদ্ধ জায়গাতেই আছে, কিন্তু এই পরিণতির শেষ হলেই তাকে বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে যেতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনেরও

এমনি করে adjustment হয়, তার পরিণতির দ্বারকে [অবরোধকে] ভাঙতে হয়— বিশালতর মুক্তিক্ষেত্রের জন্য।

এটা কোনো দার্শনিক speculationএর কথা নয়, এ হচ্ছে poetryর কথা। সত্যের positive দিক হচ্ছে আনন্দ। কিন্তু তার negative দিকও আছে। যদি সেটাকেই বড়ো করে দেখতুম তবে পদে পদে মৃত্যুর পদচিহ্ন চোখে পড়ত। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জরারই ছায়ার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে, সে চলেছে। যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে সত্যের positive দিকটা। তবে এ দুটো দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? যখন সীমার রূপের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া অসীমের অন্য গতি নেই তখন তাকে কারাগারকে ভেঙে ফেলেই বার বার শাশ্বত স্বরূপকে দেখাতে হবে।

২॥ স্টপ্‌ফোর্ড্ ব্রুকের সঙ্গে আমার বিলাতে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তাঁরও এই মত। আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা চক্র (cycle) আছে, সেটাকে যখন সম্পূর্ণ করব তখন স্মৃতির ধারা পূর্ণতা লাভ করবে। এখন আমার মনে নেই আমার পূর্বকার জীবনে কী হয়েছিল, এখন আমার সামনের দিকেই গতি। একটা অধ্যায় যখন পূর্ণ হবে তখন পিছন ও সামনের সঙ্গে আমার যোগ হবে।

'জীবনদেবতা' groupএর কবিতাগুলিতেও এই ব্যাপারটি ঘটেছে। আমার প্রথম কবিতাগুলিতে আমি নিজেই জানি না কী বলতে চেয়েছি। 'কে সে জানি নাই তারে' —এই ভাবের মধ্যে দিয়ে grope করতে করতে অজ্ঞাত-ভাবে আমার কবিতার ভিতর দিয়ে একটা অভিজ্ঞতাকে পেলুম। আমার চক্র সম্পূর্ণ হল, আমার অনুভূতির রেখাটি আবর্তন করে এসে আর-এক বিন্দুতে মিলল, ঐক্যটি পরিস্ফুট হল— আমি বুঝতে পারলুম।

তেমনি করে জীবনের এক-একটা চক্ররেখা (cycle) আছে, যখন তা সম্পূর্ণ হবে তখন অনুভূতির ভিতর দিয়ে মর্মগত (significant) সত্যটিকে বুঝতে পারা যাবে। নভেল যখন সবটা শেষ করি তখনই সব অধ্যায়ের সমষ্টিগত উপাখ্যানধারাটি পূর্ণ হয়। পিছনে যা ফেলে চললুম, তা দেখবার সময় নেই— আমাকে সামনে চলতে হচ্ছে। চলা যখন শেষ হয়ে চক্র পূর্ণ হল তখন সম্মুখ-পশ্চাৎ মিলিত হল, আমার স্মৃতিগুলি ঐক্যধারায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

তর্কের দ্বারা এই সত্যের প্রমাণ হয় না, এ ব্যাপার আমাদের instinct-

এর। যে পাখির ছানা (chick) ডিমের খোলসের মধ্যে আছে, তার কাছে প্রমাণ নেই যে বাইরে একটা জগৎ আছে। তার আবেষ্টনটি বাইরের জগতের সম্পূর্ণ উল্টো, কিন্তু এই বাইরের জগতের প্রমাণ আছে তার instinctএ— তারই প্রেরণায় সে ক্রমাগত খোলসে ঘা দিচ্ছে। তার ভিতরে তাগিদ (impulse) আছে, তার বিশ্বাস তাকে বলে দিচ্ছে, 'এখানে স্থিতি, এখানে গতি নয়, কৃত্রিম আশ্রয়কে ভেঙে ফেল্।' অথচ খোলসের গণ্ডীর মধ্যে এই মুক্ত জগতের কোনো প্রমাণ নেই।

মানুষের অভিজ্ঞতায়ও তেমনি আমরা দেখতে পাই যে, সব ধর্মের systemএ একটা অকৃতজ্ঞতার ভাব আছে। তা কেবল বলছে যে, এই-যে যা দেখছ তা শেষ কথা (absolute) নয়। সব ধর্মতন্ত্র বলছে যে, বিরুদ্ধে যেতে হবে। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস বর্তমান আছে যে, যা দেখছি তার চেয়ে যা অগোচর অপ্রত্যক্ষ তা ঢের বেশি মূল্যবান। সেই প্রেরণা, বিদ্রোহ, আমাদের instinctএ আছে। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এ তো ঠিক কথাই— বিষয়ী লোকেরা এই কথা বলছে। কিন্তু মানুষ কিছুতেই মনে করতে পারছে না যে এতেই সব শেষ। সে তর্ক করুক আর যাই করুক তার instinct তার এই দেওয়ালে ধাক্কা মারতে ত্রুটি করছে না; যা প্রত্যক্ষ-গোচর তাকে সে আঘাত করছে, ঠোকর মারছে।

সব মনুষ্যত্বের বিশ্বমানবের ইতিহাসে এই প্রেরণা (urging) চলে আসছে। যা প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক, যাকে তর্কের দ্বারা বোঝানো যায়— তাকে মানুষ অবিশ্বাস করে এসেছে। বর্বরদের তো এ বিদ্রোহের ভাব নেই, কারণ তাদের জ্ঞানানুশীলন (culture) নেই। যখন আমার বুদ্ধি আমাকে স্থির রাখতে পারল না, এগিয়ে নিয়ে গেল, তখনই সত্যকে পেলুম। যে সত্য আমার গণ্ডীকে অতিক্রম করে বর্তমান আছে তাকে তখন আমি লাভ করলুম। মানুষ যেন জ্ঞানজগতে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বেরিয়ে পড়ে। তেমনি, আমার অধ্যাত্মজগতের যে আবেষ্টন আছে তার মধ্যেকার সত্যকে নেবার জন্য আমার personalityতে 'ভূমৈব সুখম্' এই বিশ্বাসের প্রেরণা রয়েছে। আমরা জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে মেনে নিচ্ছি না, তাই ক্রমাগত আবেষ্টনে ঠোকর দিচ্ছি। এই বিশ্বাসের দ্বারা যারা অনুপ্রাণিত 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তারাই অমৃতকে লাভ করে।

৩॥ প্রত্যেক formএর মধ্যে দুটো জিনিস রয়েছে— খানিকটা তার প্রকাশিত আর বাকিটা তার আচ্ছন্ন। যা আচ্ছন্ন রয়েছে, একটা বিরুদ্ধ শক্তি তাকে ঘা না দিলে তার পূর্ণ বিকাশ হয় না। মৃত্যু প্রকাশের প্রবাহকে ক্রমাগত মুক্তিদান করে চলেছে। মৃত্যুতে formএর কোনো বিকাশ হয় না, তার renewal বা নূতন নূতন প্রকাশ হয়।

২২ যখন আমায় হাতে ধ'রে

প্রথম স্তবক॥ তুমি যখন আমায় সমাদর করে পাশে ডেকেছিলে তখন ভয় হয়েছিল পাছে তোমার সেই আদর থেকে আমি একটুও বঞ্চিত হই, পাছে অসতর্ক হয়ে আমার কিছু নষ্ট হয়— কোথাও সম্মানের কোনো হানি হয়। তখন আপন ইচ্ছামত যে নিজের রাস্তায় চলব তার উপায় ছিল না— যে পথে চললে আপনাকে সহজে প্রকাশ করতে পারি সে পথে চলতে দ্বিধা হয়েছে। আমি চলতে গিয়ে ভাবতে ভাবতে গেছি, পাছে এ দিক - ও দিক এক পা নড়তে গিয়ে তোমাকে অসন্তুষ্ট করি। তুমি যখন আমায় সম্মান দিলে তখন এই বিপদ হল, আমি যে আমার মতে সহজ পথে চলব তা হল না, আপনাকে সহজে বহন করে নেবার ব্যাঘাত ঘটল। পাছে আমি কোনো সময়ে তোমার সম্মান হারাই, পাছে কোথাও গেলে ক্ষতি হয় —এই আশঙ্কা আমি দূর করতে পারি নি।

দ্বিতীয় স্তবক॥ আজ আমি মুক্তি পেয়েছি। তোমার সম্মানের বাঁধনে বাঁধা ছিলাম, আজ মুক্তি বেজে উঠেছে— অনাদরের কঠিন আঘাতে তার সংগীত ধ্বনিত হয়েছে। অপমানের ঢাক ঢোল বেজে উঠল; আমি সম্মানের বন্ধন থেকে মুক্ত হলাম। আজ আমার ছুটি; যে খোঁটা আমার মনকে বেঁধেছিল তা আজ ভেঙে গেল, হাত-পায়ের বেড়ি খসে গেল। যা দেব আর নেব দক্ষিণে বামে তার পথ খোলসা হল। যখন সম্মানের বেষ্টনে বদ্ধ হয়ে পা ফেলছিলুম তখন আমার ভাবনা ছিল— কী দেব আর নেব। কিন্তু এবার দেবার নেবার পথ খোলসা।

আমার এক সময় ছিল যখন আমাকে কেউ জানত না; আমি বিশ্বে অনায়াসে বিহার করেছি; স্বচ্ছন্দে আকাশ-পৃথিবীতে উপরে উঠেছি, নীচে নেমেছি; কে কী বলবে, কাঁড়বে তা ভাবি নি। সে সময় আমার সম্মানের অধিকার ছিল

না। আজ আবার আকাশ-পাতাল আমায় খুব করে ডাক দিল, আজ আমি অনাদৃতের দলে। যে লাঞ্ছিত তার ভাবনা নেই; সমস্ত জগতে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে কে তাকে থামায়! এই-যে আমি ঘরের মধ্যে সম্মানের বেষ্টনে ছিলাম আজ তা ঘুচে গেল। আমি আমার আশ্রয়কে হারালাম। আজ আমায় ঘরছাড়া বাতাস মাতাল করে দিল, আর আমার ভয় নেই। যখন রাত্রে কোনো তারা খসে পড়ে, তখন সেই তারার এক-সময়ে তারকাসমাজে যে সম্মানের আসন ছিল তাকে সে হারিয়ে বসে— 'কুছ পরোয়া নেই' বলে আকাশে ঝাঁপ দেয়। তেমনি আমি আজ মরণটানে ছুটে চলেছি; বলছি, 'ভয় নেই, সব বাঁধন ছিঁড়ল।'

তৃতীয় স্তবক ॥ আমি কালবৈশাখীর বাঁধন-ছিন্ন মেঘ। এবার ঝড় আমাকে তাড়া দিল, অপমানের ঝড় অচলা স্থিতি থেকে আমাকে পথে বার করে দিয়েছে। সন্ধ্যারবির সোনার কিরণ আমাকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল; যখন কালবৈশাখী তাড়া দিল তখন আমি স্বর্ণকিরীট অস্তপারে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মেঘ হয়ে বজ্রমানিকে ভূষিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি সেই বাঁধন-হারা বৈশাখের মেঘ— একা একা আপন তেজে ঘুরে বেড়াব। বাইরের সম্মান আমাকে আলোকিত করেছিল; কিন্তু এখন আমার ভিতরে বজ্রমানিকের তেজ আছে, সেই তেজ আমাকে গৌরবান্বিত করেছে— বাইরের অস্তরবির কিরণ নয়। যে সম্মান আমাকে বাইরে টেনেছিল আমি তাকে ফেলে দিয়ে আপন অন্তরের মহিমায় একলা পথে বার হয়েছি।

আমি অসম্মানের মধ্যে মুক্তি পেলাম। সকলের চেয়ে চরম সমাদর যা তা বাইরে নেই, তা অন্তরে। যখন বাইরের খ্যাতির ঘটা ঘুচে যায় তখনই একমাত্র তোমারই আদর অন্তরে পেয়ে থাকি। সেটাই সমাদরের শেষ, তাতেই মুক্তি হয়। যা অপরের অপেক্ষা রাখে তা আমার পক্ষে বন্ধন— লোকের কথার উপর, স্তুতিবাদের তারতম্যের উপর, তার নিয়ত পরিবর্তন হয়। কিন্তু তোমার আলো যখন অন্তরে আসে তখন আপন যথার্থ স্বরূপকে জানি, তোমার চরম সমাদরে আমার বন্ধন মোচন হয়।

চতুর্থ স্তবক ॥ গর্ভে যখন সন্তান থাকে তখন সে মাকে দেখে না। মা যখন তাকে মাটির উপর দূর করে দিলে তখন যেন সে সমাদরের বেষ্টন থেকে অসম্মানের ধরণীতে বিচ্যুত হল। কিন্তু তখনই শিশু মাকে দেখতে পেল।

যখন সে আরামে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল তখন সে মাকে জানে নি, দেখে নি। তুমি যখন আদরের মধ্যে সম্মানের দ্বারা আমাকে বেষ্টিত করো— তার হাজার নাড়ীর বাঁধনে যখন আমাকে জড়িত করো, তখন তোমাকে আমি জানতে পারি না— সেই আশ্রয়কেই জানি। কিন্তু যখন তুমি সম্মানের আচ্ছাদন থেকে আমাকে দূরে ফেলো তখন সেই বিচ্ছেদের আঘাতে আমার চৈতন্য হয়, আমি তোমার সেই আবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে তোমার মুখ দেখতে পাই। যখন সম্মান থেকে মুক্ত হয়ে, তোমার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে, তোমার সামনে এসে দাঁড়াই তখনই তোমাকে দেখতে পাই।

২৩ কোন্ ক্ষণে সৃজনের সমুদ্রমন্থনে

প্রথম স্তবক ॥ সৃজনের প্রথম ক্ষণে দুই ভাবের নারী অতল অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছিল। একজন সুন্দরী; তিনি উর্বশী, বিশ্বের কামনারাজ্যে আধিপত্য করেন। আর-একজন, লক্ষ্মী, তিনি কল্যাণী। একজন স্বর্গের অপ্সরী, আর অন্যটি স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন হরণ করেন, আর-একজন পূরণ করেন।

দ্বিতীয় স্তবক ॥ একজন তপস্যাকে ভঙ্গ করে দেন। সেই ভাঙনে যে আলোড়ন জেগে উঠছে সে যেন তাঁর উচ্চহাস্য। তিনি সুরাপাত্র নিয়ে দুই হাতে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মাদকতাকে আকাশে বাতাসে বিকীর্ণ করে দিয়ে যান।

তৃতীয় স্তবক ॥ তাঁর আগমনে বিশ্ব যেন বসন্তের কিংশুকে গোলাপে ফেটে পড়তে চায়। সমস্তই যেন বাইরের দিকে বিদীর্ণ বিকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যখন হেমন্তকাল আসে তখন অন্য মূর্তি দেখি। তখন দেখি, তা ফল ফলিয়েছে, আপনাকে পূর্ণতার ভিতরে সম্বৃত করেছে; তখন বসন্তের আত্ম-বিস্মৃত অসংযম অন্তরে পরিপাক পেয়ে সফলতায় পরিণত হয়েছে। এক নারী সেই বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাইরের তাপে আন্দোলিত করে দিলেন, অন্য জন তাকে শিশিরস্নাত করে অন্তরের মাধুর্যে ফলবান করে তুললেন।

হেমন্তকালে যখন ফসল ফলল তখন তার মধ্যে চঞ্চলতা রইল না, সমস্ত স্তব্ধ হল, তার মধ্যে দক্ষিণ বাতাসের মাতামাতি থেমে গেল। হেমন্ত সেই আপনার শান্ত সফলতাটিকে বিশ্বের আশীর্বাদের দিকে উর্ধ্বে তুলে ধরে।

পুষ্পের মধ্যে প্রাণের প্রকাশের অধৈর্য আছে। কিন্তু তার এই জীবনের

আবেগ তাকে একটি পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে মৃত্যুর সীমায় গিয়ে পৌঁছতে হয়, তবেই সে চরম সার্থকতা লাভ করে। ফলে পরিপক্ক হয়। জীবন যদি আপনারই সীমারেখার মধ্যে পর্যাপ্ত হত তবে মৃত্যু হঠাৎ এসে তাকে ভয়ানক বিচ্ছেদে নিয়ে যেত এবং মৃত্যু তার একান্ত বিরুদ্ধ হত। কিন্তু মৃত্যুকে যখন কল্যাণের দিক দিয়ে দেখব তখন বুঝব যে, জীবন তার সীমাকে উত্তীর্ণ করে অমৃতের মধ্যেই প্রবেশ করছে।

সীমার মধ্যে এই অনন্তের আভাস, সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টির মধ্যে অনির্বচনীয়ের প্রকাশের মতো। শিল্পীর রচনার মধ্যে যে সংযমের ব্যঞ্জনা আছে তার দ্বারা মনে হয় যে, সবটা যেন বলা হল না। কিন্তু সেই বলতে গিয়ে থেমে যাওয়ার মধ্যে প্রকাশের অসম্পূর্ণতা বা অপরিস্ফুটতা নেই ; কারণ সেই কবিতা বা চিত্র বলাকে অতিক্রম করে যা অনির্বচনীয় তাকেই ব্যক্ত করে এবং এই সংযমের সঙ্গে তার বাণীর পূর্ণতার বিরোধ নেই। জীবনের নিত্য আন্দোলনের মধ্যে তখনই অসমাপ্তিকে দেখি যখন মনে হয় যে মৃত্যু তাকে ভয়ানক নিরর্থকতায় নিয়ে যাচ্ছে। যখন মৃত্যুর মধ্যে জীবনের একান্ত বিচ্ছেদ দেখি তখনই কাড়াকাড়ি, তখনই বিরোধ ঘোচে না। কিন্তু যখন কল্যাণকে লাভ করি তখন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনের পরমার্থতা ও অসীমতা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

আমাদের জীবনের এই ব্যঞ্জনারই প্রতীক আমরা প্রকৃতির মধ্যে পাই। গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে সেখানে সে আপন চরম অর্থকে লাভ করছে। এক জায়গায় এসে নিরর্থকতার মরুভূমিতে তো সে ঠেকে যায় নি— তা হলে হয়তো মৃত্যু তার কাছে ভয়াবহ হত। কিন্তু সে যখন সমুদ্রে বিশ্রাম পেল তখনই তার পূর্ণতার উপলব্ধি হল, তাই তার শেষটা ভয়ানক পরিণাম বলে বোধ হয় না। সেই গঙ্গাসাগরের সংগমস্থলই অনন্তের পূজামন্দির। কল্যাণী যিনি তিনি উদ্ধত বাসনাকে সেই পবিত্র সংগমতীর্থে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। একজন সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, অন্যজন তাদের সেখানে ফিরিয়ে আনেন। যেখানে শান্তির পূর্ণতা সেখানে লক্ষ্মীর স্থিতি।

উর্বশী আর লক্ষ্মী, এরা মানুষের দুটি প্রবর্তনার, প্রেরণার, প্রতিরূপ। সর্বভূতের মূলে এই দুই প্রবর্তনা আছে। একটি শক্তি, সে ভিতরে যা-কিছু প্রচ্ছন্ন আছে

তাকে উদ্‌ঘাটিত করে ; এবং আর-একটি শান্তি— সে অন্তর্নিহিত পরিপক্বতার মধ্যে সফলতার পর্যাপ্তিতে নিয়ে যায়— তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে।

ভাঙাচোরা যখন চলতে থাকে, জীবনে যখন অভিজ্ঞতার ভূমিকম্প হতে থাকে, তখন তার মধ্যে যথেষ্ট বেদনা আছে। সেই উদ্দাম শক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু কেবল যদি এই চঞ্চলতাতেই তার সমাপ্তি হত তবে দুর্গতির আর অন্ত থাকত না। তাই দেখতে পাই এর মধ্যে লক্ষ্মীর হাত আছে ; তিনি বাঁধন-ছাড়া তানকে শমের দিকে ফিরিয়ে এনে ছন্দ রক্ষা করেন। যে প্রলয়ংকরী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি সেই শক্তিই একান্ত হয় তবেই সর্বনাশ ঘটে। কিন্তু সে তো একা নয়, গতি প্রবর্তিত করবার জন্যে সে আছে। গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আর-এক শক্তি আছে, তাকেই বলি কল্যাণী। এই নিয়ন্ত্রিত গতি নিয়েই তো বিশ্বের সৃষ্টিসংগীত।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' আর 'শকুন্তলা'র মধ্যে এই দুটি শক্তির কথা আছে। শিবের তপস্যা যখন ভাঙল তখন অনর্থপাত হল, আগুন জলে উঠল। সেই অগ্নি আবার নিবল কিসে ? গৌরীর তপস্যা-দ্বারা।

'শকুন্তলা'র প্রথমাংশে ঠিক এই ভাবে ট্র্যাজেডিকে দেখানো হয়েছে। প্রবৃত্তি শকুন্তলাকে উদ্দাম করেছিল। কিন্তু পরে আবার যখন তপস্যার দ্বারা শকুন্তলা কল্যাণী হয়ে জননী হয়ে শান্তচিত্ত হলেন তখন তাঁর ইষ্টলাভ হল।

আলোচনা ॥ কালিদাসের এই দুই কাব্যে মানুষের দুই রকমের প্রবর্তনার কথা উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। গৌরী আর শকুন্তলা নারী ছিলেন এটাই কাব্যের আসল কথা নয়— কিন্তু এঁদের উপলক্ষ করে শক্তির দ্বিবিধ মূর্তি ফুটে উঠেছে সেটাই কালিদাসের আসল দেখাবার জিনিস। গৌরী অনেক দিন শান্তভাবে শিবের সেবা করে আসছিলেন। কিন্তু যে ধাক্কায় তিনি শিবের জন্যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন সেই ধাক্কা এল যার থেকে তাকে আমরা কল্যাণী বলি নে। তবু সে না হলে শিবকে জাগাবারও উপায় থাকে না। শিব যখন আপনার মধ্যে আপনি নিবিষ্ট তখন তাঁর থাকা না-থাকা সমান। যে শক্তি চঞ্চল করে তাকে বর্জন ক'রে যে শান্তি সে শান্তি মৃত্যু, তাকে সংযত করে যে শান্তি তাতেই সৃষ্টি— অতএব তাকে বাদ দেওয়া চলে না।

শকুন্তলা সংসারে অনভিজ্ঞ, তার সরলতার মধ্যে যে শান্তি সে যেন অফলা গাছের ফুলের মতো। ভরতকে যে চাই। সেই চাওয়ার মূল ধাক্কাটা

শকুন্তলাকে যে দিলে সে তাকে দুঃখই দিলে। কিন্তু এই দুঃখের ভিতর দিয়ে যখন সে জীবনের পরিণতির মধ্যে এসে পৌঁছল তখনই সে সত্যের চক্রপথ-প্রদক্ষিণ সাঙ্গ করলে। এই প্রদক্ষিণযাত্রার প্রথম বিক্ষেপে বেদনা, শেষ পরিসমাপ্তিতে শান্তি।

গেটে যে চার লাইনে শকুন্তলার সমালোচনা করেছেন, আমার মনে হয়, সেটা তিনি খুব ভেবেচিন্তেই লিখেছিলেন। এ কথা আমি আগেও বলেছি। তিনি যে বলেছেন যে কালিদাস ফুলকে ও ফলকে, স্বর্গকে ও মর্তকে একত্রিত করেছেন, এর মধ্যে গভীর অর্থ আছে। এটা নিতান্ত কবিত্বের উক্তি নয়। কুঁড়ি থেকে ফোটা ফাউস্ট্ প্রথমে নির্জনে বাস করছিলেন— জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বইয়ের পাতার মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। সেই কুঁড়ির মধ্যে পাপের আঘাত ছিল না। তিনি বললেন যে, এখানেই যদি সব শেষ হল তবে এই দুর্গতির যথার্থ পরিসমাপ্তি হল না— এবার হাওয়ায় আছাড় খেয়ে সেই ফিরে পাবার পথকে পেতে হবে। সে যদি বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝরে পড়ত তবে তো তাতে ফল ধরত না, তবে তো সে ফিরে পাবার পথ পেত না। শকুন্তলার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না, জগতের ভালোমন্দের বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সে তপোবনে সখীদের সঙ্গে সরল মনে আলবালে জলসেচনে ও হরিণশিশু-প্রতিপালনে নিরত ছিল। সেই অবস্থায় সে বাইরে থেকে কঠোর আঘাত না পেলে তার জীবনের বিকাশ হত না। যেখানে জীবনের পতন, দুঃখ সেখানে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কালিদাস তাকে তো শেষ করতে দেন নি। তিনি problem of evil নিয়ে পড়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, জগতে কিছুই স্থির হয়ে নেই; তাই কুঁড়ির থেকে ফুল, তার থেকে ফল হচ্ছে— কোনো জায়গায় ছেদ নেই।

কোনো আধুনিক শিল্পী কালিদাসের মতো 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয় অংশটা লিখতেন না। ট্র্যাজেডি দিয়েই শেষ করতেন। কিন্তু আসলে অস্তিত্বের পরম সত্য ট্র্যাজেডি নয়। তার গতিবেগ তাকে কক্ষচ্যুত, বিক্ষিপ্ত করে না— আত্ম-বিকাশের পথে তাকে নিয়ত উৎসাহিত করে। সেই আত্মবিকাশের লক্ষ্যস্থানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং আছেন ব'লেই আঘাত-সংঘাতের বেগ একান্ত হয়ে বিশ্বকে নষ্ট করে না। গাছ থেকে ফল ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেটা একান্তভাবেই ক্ষতি হ'ত যদি কোথাও ফলের প্রত্যাশার কোনো সার্থকতাই না থাকত।

দেবাসুরে যখন সমুদ্রমন্থন হল তখন সেখানে গরল পান করবার দেবতা ছিলেন, তাই সে গরল অমৃতকে অভিভূত করতে পারে নি।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকেরা কালিদাসের এই বইকে নীতি-উপদেশ-মূলক (didactic) বলবে। কিন্তু যা ধর্মনীতির দিক দিয়ে ভালো সেও কল্যাণনীতির দিক দিয়ে ভালো হবে না এমন তো কোনো কথা নেই। শিবের সতী সৌন্দর্যেরও সতী। উমা যখন বসন্তপুষ্পাভরণে সেজে এসেছিলেন তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যমদে বিশ্ব মত্ত হয়ে উঠেছিল। উমা যখন তাপসিনী সেজে আভরণ পরিত্যাগ করলেন তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যসুধায় দেবতা পরিতৃপ্ত হলেন। দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য সত্যের কল্যাণমূর্তিকে যত্নপূর্বক পরিহার করতে চায়, পাছে পাঠকরা বলে বসে এ মূর্তি সত্য নয়। পাঠকদের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠে কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর বলবার সাহস তার নেই। সত্যকে বিরূপ করে দেখিয়ে তবে সে প্রমাণ করতে চায় যে, সত্যের সে খোশামুদি করে না। সত্যের সুন্দর রূপ প্রকাশ করাকে তারা ইস্কুলমাস্টারি বলে ঘৃণা করে। এ কথা ভুলে যায় নীতিবিদ্যালয়ের ইস্কুলমাস্টার কল্যাণকে, সত্য এবং সুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থে পরিণত করে তুলেছে— কবি যদি সেই বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে সত্যের পূর্ণতা দেখাতে পারে তা হলেই কবির উপযুক্ত কাজ হয়।

২৪ স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই

প্রথম স্তবক॥ মানুষ যে স্বর্গকে খোঁজে তাকে সে পৃথিবীর বাইরে মনে করে; তাই সে স্বর্গে পৌঁছবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করে, সংসার ভাসিয়ে দেয়। যে স্বর্গকে মানুষ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জানে তা অস্পষ্ট, অব্যক্ত, সৃষ্টিছাড়া।

দ্বিতীয় স্তবক॥ আমি অনেক দিন পর্যন্ত সেই সৃষ্টিছাড়া স্বর্গে অব্যক্তের ভিতরে শূন্যে শূন্যে ঘুরেছিলুম। সেই স্বর্গ, যা অস্ফুট ছিল, যার অবস্থা প্রকাশের পূর্বকার অবস্থা, তার থেকে যেই আমি মাটিতে জন্মালুম, পরম সৌভাগ্যে সেই ধুলোমাটির মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এলুম, অমনি সুস্পষ্ট রূপলোকে স্থান পেলুম।

আমার এই জন্মলাভ যেন অনেক দিনকার সাধনার ফলে। এই স্বর্গের ধারণা যেন কেবল একটা ইচ্ছারূপে ছিল, তা প্রথমে রূপ ধরে নি।

অনেক দিন পর্যন্ত যেন সৃষ্টিনাট্যের নেপথ্যগত একটি ইচ্ছাস্বর্গের মধ্যেই ঘুরছিলুম। ভাবুকের মনের মধ্যে যখন কোনো-একটা ভাব থাকে তখন সে একটি বৃহৎ অপ্রকাশের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু যেই সে ভাব একটু রূপ গ্রহণ করল অমনি অনেকখানি ভাবের নীহারিকা ব্যক্ত আকার ধারণ করল, অতখানি ব্যাপক অস্ফুটতা যেন সার্থক হয়ে গেল। যে স্বর্গ অব্যক্ত তা অনন্ত অসীম হতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র পরিমাণে রূপ দান করেও অনন্ত ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভ করে। তাই আমার পক্ষে মানুষ হয়ে জন্মানো কত বড়ো কথা! এই-যে আমি আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করছি, তার মধ্যে যেন অব্যক্ত অসীমের সৌভাগ্য বহন করছি। এই-যে আমি ধুলোমাটির মানুষ হয়েছি, এই হওয়ার মধ্যেই কত যুগের পুণ্য! আমার দেহে স্বর্গ তাই কৃতার্থ।

সেই স্বর্গ আমাকে আশ্রয় করে খেলা করতে পারল। আমাকে নিয়ে যে জন্মমৃত্যুর ঢেউ উঠল তার সংঘাতের দোলে সে আপনাকে দোলাতে পারল। স্বর্গ আমার মধ্যে নিত্যনবীন আনন্দচ্ছটায় লীলায়িত হচ্ছে, আমার ভালোবাসা বিচ্ছেদ-মিলন লাভ-ক্ষতি এই-সমস্তকে আপন খেয়ালে ভেঙে-চুরে নানা রঙে বিচ্ছুরিত করছে।

তৃতীয় স্তবক॥ স্বর্গ নীরব ছিল, তার মুখে বাণী ছিল না; আমি যেই গান গাইলুম অমনি সেই স্বর্গ বেজে উঠল। সে আমার প্রাণের গানে আপনাকে খুঁজে পেল। আমার মধ্যে অব্যক্ত আপনার যে লক্ষ্যকে খুঁজছে তাকে আমার প্রাণের গতির মধ্যে, অভিব্যক্তির মধ্যে লাভ করেছে; তাই অসীম আকাশ আজ আমার মধ্যে নিবিষ্ট, তাই আমার সুখদুঃখের ঢেউয়ের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ সংহত।

আজকে দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে শঙ্খধ্বনি উঠেছে সে তো আমার প্রাণেরই ক্ষেত্রে, আমারই মধ্যে। সাগর তার বিজয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে— সে তো বাজছে আমারই চিত্তকূলে। আমি প্রাণ পেয়েছি, চেতনা পেয়েছি, এই জন্যই তো অঙ্গনে অঙ্গনে স্বর্গলোকের শঙ্খ বেজে উঠল— নইলে বাজবে কোথায়? তাই তো ফুল ফুটেছে। পুরাঙ্গনারা যেমন অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে উলুধ্বনি করতে করতে ছুটে আসে, তেমনি আমি আসাতে ফুলের ঝরনার ধারার মধ্যে হুলুস্থুল বেধে গেছে।

অনন্তস্বর্গ মাটির মায়ের কোলে আমার মধ্যে জন্মেছে, বাতাসে এই বার্তা চারি দিকে প্রচারিত হল।

এপর্যন্ত এই শ্লোকগুলির মানে যা বললাম তাতে একে একরকম ব্যাখ্যা-মাত্র করা হল। কিন্তু কবিতা তো তত্ত্ব নয়, তা রস। কবি যে আনন্দের কথাটা এই কবিতায় বলতে চাচ্ছে সে হচ্ছে প্রকাশের আনন্দ।

সন্তান যখন বাপ-মার কোলে জন্মাল তখন বিপুল আনন্দে ঘর ভরে উঠল, এ যেমন আমাদের মানবগৃহে, তেমনি অসীমের ক্ষেত্রেও রূপ যখনই বাস্তব হয়ে উঠল তখনও এই ব্যাপারটি ঘটছে। বাস্তব হচ্ছে কোন্‌খানে? আমারই চৈতন্যের আলোকিত ক্ষেত্রে। এই জন্যে আমার চোখে যে মুহূর্তে দৃষ্টি জাগল অমনি যেন সোনার কাঠির স্পর্শে একটা সম্পূর্ণ বিশ্ব উঠল জেগে। যেই আমার কানের দ্বারে চৈতন্য এসে দাঁড়াল অমনি শব্দের জগতে একি কোলাহল! এই-যে আমার চিত্তের প্রাঙ্গণে প্রকাশের মহামহোৎসব উঠেছে কবি তারই বিচিত্র বিপুল আনন্দের কথা এই কবিতায় বলেছে। এর তত্ত্ব কত লোকে কত রকম করে বুঝবে বোঝাবে, কিন্তু এর রসটুকুই কাব্যে প্রকাশ করা চলে।

যা স্পষ্ট নয়, ব্যক্ত নয়, সেই ঠিকানাহীন দেশকে আমি 'স্বর্গ' নাম দিচ্ছি।

পুণ্য সঞ্চয় করলেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে এই কথাই চলতি কথা; কিন্তু আমি বলছি যে, আমি স্বর্গ থেকেই পুণ্যের জোরে মর্তে নেমে এসেছি। আমি যখন গণ্ডীবদ্ধ প্রকাশের মধ্যে পরিস্ফুট হলাম তখনই আমার সকল অপূর্ণতা সত্ত্বেও মর্তের মধ্যে স্বর্গ ধন্য হল।

আলোচনা॥ এই স্বর্গমর্তের ভাবটা বহু পূর্বে আমার বাল্যকাল থেকেই আমাকে অনুসরণ করেছিল।

অল্প বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এ এই আইডিয়ার ব্যাকুলতাকে আমি এক রকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। সন্ন্যাসী বললে, 'যে ভববন্ধন সীমার শৃঙ্খলে আমাকে বেঁধে রাখে আমি তাকে ছিন্ন করে অসীম প্রাণকে পাবার জন্য তপস্যা করব।' সে লোকালয়কে 'তুচ্ছ মায়া' 'অন্ধতার গহ্বর' ব'লে সমস্ত ত্যাগ করে দূরে চলে গেল। আকাশের রস গন্ধ বর্ণচ্ছটা সব তার চৈতন্যের থেকে অপসারিত হল, সে আপনাকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার করে অসীমকে পাবার জন্য পণ করল। তার পর কোথা থেকে একটি ছোটো

মেয়ে দেখা দিল; সে নিরাশ্রয় ছিল, সন্ন্যাসী তাকে গুহায় নিয়ে এল। মেয়েটি তাকে ধীরে ধীরে স্নেহের বন্ধনে বাঁধল। তখন সন্ন্যাসীর মনে ধিক্কার হল; সে ভাবতে লাগল যে, এই তো প্রকৃতিমায়াবিনী দূতী করে এমনি করে মেয়েটিকে পাঠিয়েছে, সে সন্ন্যাসীকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন করে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়। এই সংগ্রাম যখন চলছে তখন একদিন সে ক্রোধের বশে মেয়েটিকে ত্যাগ করল। মেয়েটি যাকে নিতান্তভাবে আশ্রয়স্থল বলে জেনেছে তার সেই অবলম্বন চলে যাওয়াতে, সে ছিন্ন লতার মতো লুটিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী যত দূরে সরে যেতে লাগল, ততই মেয়েটির ক্রন্দন তার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হতে লাগল। শেষে মেয়েটি যে বাস্তব, মায়া নয়, তা সে হৃদয়ের বেদনার আঘাতে বুঝতে পারল। মনের এই অবস্থায় সে দূরে দাঁড়িয়ে লোকালয়ের দৃশ্য দেখতে লাগল; তার মাধুর্যে, মানুষের স্নেহপ্রীতি-সম্বন্ধের সরসতায় তার মন ভরে উঠল। সে বললে, 'ফেলে দিলুম আমার দণ্ড কমণ্ডলু, দূর হয়ে যাক এ-সব আয়োজন! সীমাকে বর্জন করে তো আমি কোনো সত্যই পাই নি। একটি ছোটো মেয়েকে স্নেহ করতে পেরেছিলুম বলেই তো সেই রসের মধ্যে অসীমকে পেয়েছি— তার বাইরে তো অনন্তস্বরূপের প্রকাশ নেই।' —এই ভাবটাই আমার নাটিকাটির মূল সুর।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এর প্রতিপাদ্য বিষয়টা বাল্যকালে আমার নানা কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। সীমার সঙ্গে যোগেই অসীমের অসীমত্ব, এ কথা ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে। 'অবিদ্যা' বা সীমার বোধকেই একান্ত বলে জানার মধ্যে অন্ধ তামসিকতা আছে, আবার অসীমের বোধকেই একান্ত করে দেখার মধ্যেও ততোধিক তামসিকতা আছে— কিন্তু যখন বিদ্যা-অবিদ্যাকে মিলিয়ে দেখব তখনই সত্যকে জানব।

সীমাকে নিন্দা করা গায়ের জোরের কথা। ঐকান্তিক (absolute) সীমা বলে কিছু নেই, সব সীমার মধ্যেই অনন্তের আবির্ভাবকে মানতে হবে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এর সন্ন্যাসী সীমাকে 'না' করে দেওয়ার যে মুক্তি তার মধ্যে দিয়েই সার্থকতাকে চেয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে যায় অন্ধকারে।

তেমনি আবার সীমা-জগৎকে অসীম থেকে বিযুক্ত করে দিয়ে তার মধ্যে বদ্ধ হলে সেও ব্যর্থতা। কাব্যে শব্দকে বাদ দিয়ে যে রসিক রসকে পেতে

চায় সে কিছুই পায় না, আবার রসকে বাদ দিয়ে যে পণ্ডিত শব্দকে পেয়ে বসে তার পণ্ডতারও সীমা নেই।

২৮ পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান

প্রথম স্তবক॥ তুমি মানুষ ছাড়া আর সব জীবকে যেটুকু দিয়েছ সে সেইটুকুই প্রকাশ করে। পাখিকে সুর দিয়েছ, সে সেই বাঁধা সুরের দানটি বার বার ফিরিয়ে দেয়, তার বেশি সে দেয় না। আমাকে তুমি যে সুর দিয়েছ সে সুর তোমার, কিন্তু আমি তার বেশি তোমায় ফিরিয়ে দিই— আমি যে গান গাই সে গান আমার।

দ্বিতীয় স্তবক॥ তুমি বাতাসকে ধরে রাখ নি। তার কোনো বাঁধন নেই, সে অনায়াসে তোমার সেবা করে, বিশ্বকে বেষ্টন ক'রে কাজ করে। আমাকে তুমি যত বোঝা দিয়েছ তাকে আমার বয়ে বেড়াতে হয়। আমার সেই বন্ধন থেকে মুক্তিকে আপনিই উদ্‌ভাবন করতে হবে। আমি একে একে নানা বন্ধনদশার পাশমোচনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর থেকে মৃত্যুতে আপনাকে রিক্তহস্ত করে বয়ে নিয়ে যাব। আমি তোমার সেবার জন্য স্বাধীনতা অর্জন করব। এই হাত দুটিকে মুক্ত করে তোমার কাজের জন্য নিযুক্ত করব, বলব— তোমার আদেশে তোমারই কাজে এখন থেকে প্রবৃত্ত হলুম। তুমি আমাকে বন্ধন দিলে, কিন্তু আমাকে ভিতর থেকে মুক্তিতে বিলীন হতে হবে— আমার কাছে তোমার দাবি বেশি।

তৃতীয় স্তবক॥ তুমি পূর্ণিমায় হাসি ঢেলে দিচ্ছ— ধরণীকে হাস্যময় সৌন্দর্য দান করেছ। ধরণীর অন্তস্তলে যে রস নিহিত আছে সে ফিরে সেই রসকে ঢেলে দিচ্ছে। কিন্তু আমায় তুমি দুঃখ দিয়েছ, তার ভার আমায় বইতে হচ্ছে। সমস্ত জীবনের এই দুঃখকে অশ্রুজলে ধুয়ে ধুয়ে তাকে আনন্দ করে তুলে আমাকে তোমার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে, তোমার কাছে নিবেদন করতে হবে। আমি দিনশেষে মিলনক্ষণে সকল দুঃখকে আনন্দময় করে তোমার কাছে নিয়ে যাব, আমার উপর এই ভার রয়েছে।

চতুর্থ স্তবক॥ তুমি তোমার এই ধরণী মাটি দিয়ে তৈরি করেছ, এই ধরণী আলো-অন্ধকারে সুখ-দুঃখে মিলিত হয়ে রয়েছে। আমায় তুমি এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছ কিন্তু কিছু সম্বল সঙ্গে দিলে না— একেবারে হাত-শূন্য করে দিয়েছ,

আর আড়ালে থেকে তুমি আমায় দেখে হাসছ। তুমি আমাকে এমনি অবস্থায় মাটিতে রেখে দিয়ে বললে, 'তোমার উপর ভার হচ্ছে এখানে স্বর্গ রচনা করবার। তুমি অন্ধকার থেকে আলো উদ্‌ভিন্ন ক'রে, মৃত্যু থেকে অমৃতকে বহন ক'রে এনে তোমার আপনার জীবন দিয়ে এই মর্তলোকে স্বর্গ গড়ে তুলবে, তোমার উপর এই ভার রইল।'

পঞ্চম স্তবক॥ প্রকৃতিতে সব জীবকে তুমি তোমার দানের দ্বারা ভূষিত করলে এবং যাদের যা দিয়েছ তারা সেই সম্পদকেই প্রকাশ করছে। কেবল আমার কাছে তোমার দাবি রয়েছে, আমার কাছে তোমার আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। তাই আমি নিজের প্রেম দিয়ে যে অর্ঘ্য রচনা করে দিচ্ছি সেই যত্নের দান তুমি তোমার সিংহাসন থেকে নেমে এসে বক্ষে তুলে নাও। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার পরিমাণ অল্প, কিন্তু আমি যে দান তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তা অনেক বেশি।

তুমি আমাকে অল্প দিয়ে তোমার জীবনলোকে ছোটো নগণ্য প্রাণী করে দাও নি, কারণ, আমার প্রতি তোমার যে দাবির জোর আছে তাতে আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন তা আমার জীবন থেকে উৎসারিত হয়। আমি কেবল স্বর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু তোমার দাবি আছে ব'লে তা সংগীত হয়ে প্রকাশিত হয়। তুমি আমাকে বন্ধন দিয়েছ কিন্তু বলেছ যে, এই বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলতে হবে। তুমি চাও যে আমি মুক্তিলাভ করি। তোমার দাবি আছে ব'লেই মানুষকে দুঃখের উপর জয়যুক্ত হয়ে সেই দুঃখকে আনন্দধারায় ধৌত করে পূর্ণ করে তুলতে হয়, মানুষের জীবনের গতি তাই মুক্তির দিকে ধাবিত হয়। কিসে তার দুঃখমোচন হয় সেই সন্ধানে সে প্রবৃত্ত হয়। তুমি পৃথিবীকে আপনি রচনা করলে, কিন্তু স্বর্গ রচনা করবার ভার দিলে মানুষের উপর। পৃথিবীতে মানুষের যে সূচনা হল তাকে তো জ্যোতির্ময় বলা যায় না, কিন্তু মানুষকে সেই শূন্যতা থেকে এই মর্তধামেই অপূর্ব আলোকে উদ্‌ভাসিত স্বর্গ রচনা করে তুলতে হবে। তাই মানুষ স্থির হয়ে বসে নেই— তার বিরাম নেই, শান্তি নেই। তার সঙ্গে তোমার এই-যে কঠিন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে তারই তাগিদে সে আপনার অন্তর্নিহিত সম্পদকে ক্রমাগত ব্যক্ত করে। তাই তোমার জন্য তার যে প্রেমের অর্ঘ্য রচিত হয় তাকে তুমি বহুমূল্য রত্নের মতো আদরের সঙ্গে বক্ষে তুলে নাও।

মানুষ তার ইতিহাসে যে মূলধন নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে তার মধ্যেই তো সে থেমে থাকে না। সাহিত্য রাজনীতি ধর্মকর্মতে সে ক্রমাগত উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠছে। মৌমাছিরা যখন চাক বাঁধতে শুরু করে তখন যার যে পরিমিত সামর্থ্যটুকু আছে সে সেই অনুসারে একই বাঁধাপথে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে কাজে লেগে যায়, কিন্তু মানুষ তো সংকীর্ণ পথে চলে না, তার যে কোথাও দাঁড়াবার জো নেই। তার হাতে যে উপকরণ আছে তাকে বিশালতর করে তুলতে হয়। সে আপনাকে আরও বিকশিত করবে, সে আরও এগিয়ে চলবে। ইতিহাসে তার এই আহ্বান রয়েছে।

মানুষের বর্তমান ইতিহাসেও এই বাণী রয়েছে। সে অতীত মানবদের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না— যা পেয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পদ দিয়ে তার সাজি ভরতে হবে। মানুষের এই গৌরব আছে। সে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলল ; বলল— এই মাটির ধরা আমাকে যা দিয়েছে আমি তার চেয়ে আরও বেশি একে দিয়েছি।

'দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে থুয়ে'— যেখানে অপূর্ণতা সেখানেই শক্তির খর্বতা, সেখানেই দুঃখ। যখন মানুষের বাইরের অবস্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্য ঘটে, সে জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্যকে পায় না, তখন তার জীবনবীণা ঠিক সুরে বাজে না। এই-যে দুঃখের বাধা মানুষের পথরোধ করে, এরই ভিতর থেকে তাকে পথ কেটে বার হতে হবে। সে শক্তি খাটিয়ে মহত্ত্বকে বাধামুক্ত করে প্রকাশ করবে, সকল আন্তরিক দৈন্য অপসারিত করে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবে —এই তার সাধনা। তার এই গোড়াকার দৈন্যই যদি চরম হত তবে সে এক রকম করে বোঝাপড়া করে নিতে পারত, কিন্তু তার অন্তরে ধর্মবুদ্ধি বা আর-কোনো অনুভূতির চেতনা আছে যা তাকে ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে সম্মুখপানে চালিত করছে।

২৯ যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা

এই কবিতা আগের কবিতার আনুষঙ্গিক। এমন যেন কেউ মনে না করেন যে, এতে আমি সৃষ্টির আরম্ভের কোনো বিশেষ সময়কার কথা বলেছি। এতে কোনো সৃষ্টিতত্ত্ব নেই। এখানে 'আমি' মানে ব্যক্তিবিশেষ নয়, 'আমি' মানে হচ্ছে— যে আমি ব্যক্ত জগতের প্রতিনিধিস্বরূপ। বিশেষ সময়ে আমি সৃষ্ট হই

নি ; এমন কোনো এক সময় ছিল যখন আবীঃ যিনি তাঁর প্রকাশ ছিল না তা বিশ্বাস করা যায় না।

প্রথম স্তবক॥ তুমি যে কোনো সময়ে অব্যক্ত ছিলে তা নয়, কিন্তু যদি কল্পনা করা যায় যে আমি কোথাও নেই, তবে সেই অবস্থায় কিরকম হবে এখানে তাই আমি বলেছি। আমি যখন নেই তখন তুমি আপনাকে দেখতে পাও নি, সে অবস্থায় কারও জন্যে তোমার পথচাওয়া ছিল না। এই-যে সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে আজ ধীরে ধীরে আমার বিকাশ হচ্ছে, এই-যে আমার এই চলার জন্য তোমার অপেক্ষা আছে, এই-যে তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকো —তখন এ-সব কিছুই ছিল না। যখন আমার অস্তিত্ব ছিল না ব'লে আমি কল্পনা করছি তখন এই-যে দু পারের আকাঙ্ক্ষার আবেগের হাওয়া আজ বইছে সেদিন তা ছিল না। আজ আমার থেকে তোমার কাছে আর তোমার থেকে আমার কাছে কিছু-কিছু aspiration, আকাঙ্ক্ষা, আসছে যাচ্ছে— আমাদের উভয়ের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার আসা-যাওয়ার হাওয়া বইছে। কিন্তু সেদিন তা ছিল না, এপারের সঙ্গে ওপারের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

দ্বিতীয় স্তবক॥ আমার মধ্যেই তোমার সুপ্তির থেকে জাগরণ হল। আমার মধ্যেই বিশ্বের প্রকাশ হল, বিশ্ব যেন ঘুম থেকে উঠল। আলোর যে ফুল ফুটল তা আমার জন্যই বিকশিত হল, নইলে তার দরকার ছিল না। আমাকে তুমি এখানে নিয়ে এসে কত রূপে যে ফোটাচ্ছ তার ঠিক নেই। তুমি কত রূপের দোলায় আমাকে দোলালে— 'আমাকে', অর্থাৎ আমায় নিয়ে যে বিশ্ব, যে দৃশ্য, সেই সকলকে।

তুমি যেন আমাকে বিক্ষিপ্ত করে দিলে, আমাকে এমনি করে ছড়িয়ে দিলে ব'লেই তোমার কোল ভরে উঠল। তুমি আমাকে ফিরে ফিরে নব নব রূপান্তরে নূতন করে করে পাচ্ছ।

তৃতীয় স্তবক॥ আমাকে এই নানা ভাবে পাওয়াতেই তোমার আনন্দ। আমি এলাম অমনি সব শব্দিত হয়ে উঠল ; নইলে, তার আগে সব স্তব্ধ ছিল। আমার মধ্যেই তোমার দুঃখ, আমি এসেছি বলেই তোমাকে দুঃখ দিলাম। আমি এলাম ব'লে যে আনন্দের উদ্‌বোধন হল তার মধ্যে তেজ থাকত না যদি দুঃখ তাকে না জ্বালাত ; আমার দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই আনন্দশিখা

জ্বলে উঠছে। জীবন-মরণের এই-যে আন্দোলন এ আমায় নিয়েই হয়েছে। আমি এলাম ব'লেই তুমি এলে। আমার স্পর্শে তুমি আপনাকে স্পর্শ করলে। আমায় পেয়ে তোমার বক্ষ ভরে উঠল।

চতুর্থ স্তবক ॥ আমার কত অভাব ত্রুটি অসম্পূর্ণতা আছে ; তাই আমার চোখে লজ্জা, মুখে আবরণ— আমি সেই আবরণের ভিতর দিয়ে তোমায় দেখতে পাই না। তাই আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে, পদে পদে বাধা আছে বলে জীবনে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হল না। কিন্তু আমি জানি যে, আমি এমনি ভাবে আচ্ছন্ন আছি বলে তুমি অপেক্ষা করে আছ, কবে এই আবরণ উদ্‌ঘাটিত হবে। এই আবরণ একদিন খসে পড়ে যাবে না তা নয়— কারণ, তোমার আমাকে দেখবার জন্য কৌতুকের অন্ত নেই, তুমি ক্রমশ আমার মধ্যে তোমার দৃষ্টি পেতে চাও। আমাকে দেখবে বলেই তুমি এত আলো জ্বালিয়েছ, তুমি আমার আত্মার সঙ্গে পরিচিত হবে বলেই তোমার এই সূর্যতারার আলো জ্বলছে।

আলোচনা ॥ ১ ॥ 'আমি এলেম, এল তোমার দুঃখ'— বিশ্বের দুঃখ তো আমার সীমার মধ্যেই আছে। তোমার প্রকাশে যদি দুঃখ এসে থাকে তবে সে তো আমিই বয়ে এনেছি। তোমার আপনার মধ্যে দুঃখ নেই, আমিই তাকে এনেছি। কিন্তু তাতেই তো সব শেষ হয়ে যায় নি, আমার এই দুঃখের ভিতর দিয়েই তোমার আনন্দের উপলব্ধি হচ্ছে। অদ্বৈতের মধ্যে যেটা দ্বৈত সেটাই বড়ো কথা। শুধু monism তো negative। সীমা-সম্পর্কিত দুঃখের বিচিত্র লীলার ভিতরে যে আনন্দ সেটাই সত্যিকারের জিনিস।

এই কবিতায় 'আমি' মানে হচ্ছে— সৃষ্ট জগৎ।

২ ॥ আমার দেহ হচ্ছে অসীমের প্রতিরূপ। সূর্যের আলো, প্রাণ, বাতাস, জল, আমার দেহ —এরা সব আকস্মিক জিনিস নয়, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই অসীমের background আছে। আমার মন যদি একটা isolated fact হয় তবে আমি কিছুই জানতে পারব না। কিন্তু আসলে আমার মনের একটা বাস্তবতার background আছে ব'লেই আমি বুদ্ধির ও চৈতন্যের জগৎকে পাচ্ছি।

বিজ্ঞান এ পর্যন্ত বলে এসেছে যে প্রাণ ও অপ্রাণের মধ্যে ছেদ আছে। প্রাণবান জিনিস প্রাণেই নিঃসৃত হচ্ছে, কম্পিত হচ্ছে। বিজ্ঞান একে radio-

activity'র গতিশীলতা বলেছে। কিন্তু জগতের প্রাণের এই গতিবেগ অসীমেরই গতিশীলতার একটা প্রকাশ। বিজ্ঞানবাদ অনুসারে অণুপরমাণু কিছুই স্তব্ধ হয়ে নেই, তারা নিজের বেগে চলেছে— nucleusএর চারি দিকে electronগুলি সৌরজগতের আবর্তনের মতো ঘুরছে, কিন্তু এদেরও অসীমের background আছে। আমরা কি বলতে চাই যে, এই-যে আমরা আপনাকে জানছি, আমাদের মনের সঙ্গে বিশ্বনিয়মের চিরন্তন যোগ রয়েছে, এটা কেবল আকস্মিক যোগ? আর, দেহমনের উপর যে personality আছে তার কি infinite background নেই? এ হতেই পারে না। 'অন্নং ব্রহ্ম'— আধিভৌতিক জগতেও অসীম আছেন, তার আনন্দের মধ্যেই তাঁর personalityর বিকাশ। অন্ন এক অর্থে impersonal। আপনাতে আপনার উপলব্ধি ও ঐক্যবোধের মধ্যে যে আনন্দ আছে তাকেই personalityর বোধ বলা যায়। আমার personality তখনই দুঃখ পায় যখন বাইরে কিম্বা অন্তরে এই ঐক্যের বিচ্যুতি ঘটে।

শৈশব থেকে এপর্যন্ত যে-একটা ঐক্যধারার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি, যার মধ্যে আমার আনন্দ আছে, সেই ঐক্যের ভাবটিকেই আমি personality বলেছি। অসীমের personality ও আমার ঐক্যবোধের মধ্যে harmony আছে। যখন অসীমস্বরূপ দ্বৈতের মধ্যে ঐক্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন তখনই তার মধ্যে আনন্দ ও প্রেম জাগে। বন্ধুদের আত্মার প্রেমের মধ্যে এক জায়গায় বিচ্ছেদ আছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা ঐক্যসূত্র আছে। বিশ্বের মূলেও এই ব্যাপারটি আছে। আমি আর-এক 'আমি'র প্রতিরূপ। আমার অন্তরের উপলব্ধিতে জীবলোকের নাট্যলীলা (drama of existence) আছে। আমার থাকার মধ্যে বিশ্বের মূলের এই থাকা আছে। আমি মানে একমাত্র 'আমি' নয়; আমার ভোগ করা, দেখা, জানার উপর যে আমিত্ব আছে তাই। আমি এসেছি ব'লেই দুঃখ আছে, আনন্দ আছে। আমি এসেছি ব'লেই এপার থেকে ওপারের চিরন্তন যোগাযোগ চলছে।

৩০ এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো

প্রথম স্তবক॥ যে দেহভেলা অবলম্বন করে এতদিন জীবনস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিলুম, সেই ভেলাকে এবার ভাসিয়ে দাও। তাকে ফেলে দাও, সে চলে

যাক, তার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগ নেই— এবার তার কাজ ফুরালো। অমুক ঘাটে পৌঁছব কিনা, আমার কী হবে, আলো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কোন্ পথ বেয়ে যাব —এ-সব প্রশ্ন নাই করলুম। এর উত্তর নাই বা জানলুম।

দ্বিতীয় স্তবক॥ না-জানার দিকে যাত্রা করাই তো আমার আনন্দ। অজানাই আমাকে এখানে এনেছিলেন, তিনিই আমাকে আমার এই জন্ম-গ্রহণের দ্বারা জানাশোনার বন্ধনে বেঁধে দিলেন, আবার তিনিই তো সব গ্রন্থি খুলে সব চুকিয়ে দেবেন। আবার ঠিক সব খাপ খেয়ে যাবে, কোনোখানে অসামঞ্জস্য থাকবে না। জানা এসে বসে বসে সব বাঁধে, তাই আমরা এখানে এসে সব ঘরকন্না গুছিয়ে নিই, নানা পরিচয়ের মধ্যে খুব কষে সব জেনে নিই— 'এ আমার অমুক, সে আমার অমুক।' এই-সব জানাজানির ভিতরে বন্দী হই, এমন সময়ে হঠাৎ অজানা খামকা এসে ধাঁদা লাগিয়ে দিয়ে জানার বাঁধন সব ছিঁড়ে দেয়।

তৃতীয় স্তবক॥ এই ভেলার যে হালের মাঝি সে তো অজানা। সেই অপরিচিতই আমার কর্ণধার। সে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অজানাই আমার জানার বন্ধন কেবলই ছিন্ন করে করে আমাকে মুক্তি দেয়। সে থেকে থেকে বার বার মুক্তি দিতে দিতে আমাকে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। তাই তো আমার সামনের দিকে যে অজানা আছে তাকে আমি ভয় করতে চাই নে। আমি জানি সেই আমার হালের মাঝি, সে আমার এই জীবনেও আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মৃত্যু হঠাৎ এসে আমাকে চমক লাগিয়ে দেয়। আকস্মিক ঘটনা আমাকে ত্রস্ত করে। এমনি করে নির্দয় যিনি তিনি আমাকে ভালোবাসেন ব'লে অপূর্বের অপরিচিতের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার ভয় ভাঙিয়ে দেন।

চতুর্থ স্তবক॥ তুমি ভাবছ যে, যে দিন চলে গেছে তাকেই ভালো জানি, অতএব তারই পুনরাবৃত্তি হোক— তাকেই বারে বারে ফিরে পাই। কিন্তু তুমি যে কূল ছেড়েছ সে কূলে আর কিছুতেই ফিরে যাবে না। তোমার কি পিছনের 'পরেই একমাত্র নির্ভর? ঐ পিছনই কেবল বিশ্বাসযোগ্য? যা অতীত তাই কেবল তোমার প্রধান সম্পদ এমনি কি তুমি ভাগ্যহারা? কেন তুমি বলতে পারলে না সামনের 'পরে তোমার বিশ্বাস আছে, সেখানে

তোমার ভয় নেই? পিছন তোমাকে কিছুতে বেঁধে রাখবে না এতেই তোমার আনন্দ হোক।

পঞ্চম স্তবক॥ ঘণ্টা বেজেছে, সভা যে ভেঙে গেল, নৌকো ছাড়তে হবে— জোয়ার উঠেছে। তিনিই অজানা যাঁর সঙ্গে দেখা হবে ব'লে মনে করি কিন্তু যাঁর মুখ দেখা আমার হয় না। তাঁকে জানি না ব'লে একটু ভয় হয় বৈকি, একটু বুক দুলে ওঠে, মনে হয় কী জানি কেমন করে অজানা আমার কাছে দেখা দেবে। এই শ্যামল পৃথিবী তার সূর্যালোক নিয়ে এবারকার মতো দেখা দিল, আবার অজানা কেমন করে দেখা দেবে কে বলতে পারে? এই পৃথিবীতে জন্মমুহূর্ত থেকে সূর্যালোকে লোকালয়ের নানা দৃশ্য নানা ঘটনা নানা অবস্থার মধ্যে অজানাকে ক্রমশই জানার ভিতর দিয়ে স্পর্শ করতে করতে চলেছি। অজানাকে কেবলই জানা, না-পাওয়াকে কেবলই পেতে থাকাকেই তো জীবন বলে। এই জীবনকে তো ভালোবেসেছি, অর্থাৎ সেই অজানাকে লেগেছে ভালো। সমুদ্রের এপারে তাকে ভালো লেগেছিল, সমুদ্রের ওপারেও তাকে ভালো লাগবে।

৩১ নিত্য তোমার পায়ের কাছে

তোমার নিজের বিশ্বে তোমার পুরো অধিকার আছে, কারণ সে যে তোমারই জিনিস। তাতে তো তোমার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তুমি এমনি পূর্ণ হয়ে আছ ব'লে তোমার তাতে কোনো আনন্দের উপলব্ধি হয় না। এই বিশ্ব তোমার এত আপনার বস্তু, সব জিনিসেই তুমি এমন সম্পূর্ণ অধিকারী যে, তার থেকে চাইবার আর পাবার তোমার কিছুই বাকি নেই। তাই এই পূর্ণতাই তোমার আনন্দের ব্যাঘাত করছে। যেটা না চেয়ে লাভ করা, যেটা পেয়েছি, রয়েছে, তাতে কোনো আনন্দ নেই।

সেজন্য তুমি বিশ্বপতি হয়ে কী করলে? তুমি তোমার সব ধন আমার ভিতর দিয়ে নেবার দরকার বোধ করছ, নয়তো তোমার নিজের ধন ভোগ করে আনন্দ পাচ্ছ না। তোমার বিশ্বকে তুমি আমার ভিতর দিয়ে নিয়ে আবার ফিরে পাচ্ছ, যেন হারানো ধনকে নূতন করে পেয়ে গেলে। তুমি আমাকে যে অধিকার দান করেছ তাকে আবার আমার মধ্যে দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আনন্দিত হচ্ছ।

যে ঐশ্বর্য চিরকাল ভাণ্ডার পূর্ণ করে রয়েছে তা তোমার পক্ষে অতীত, কিন্তু তুমি তাকে নিয়ত বর্তমান করছ আর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছ। সেই সম্পদকে যখন তুমি আমার করে দিচ্ছ তখনই তাকে নিয়ত নানা ভাবে পাচ্ছ।

তোমার যে সূর্য সকালে উঠছে আর প্রতিদিন বিশ্বে যে শান্তি ও সৌন্দর্যের ছবি ফুটে উঠছে, তাদের তুমি আমার দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নূতন করে কিনে নিচ্ছ। তুমি আমার সেই নূতন করে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে তোমার চিরকালের সূর্যকে নব নব রূপে পাচ্ছ।

তোমার প্রেমের যে স্পর্শমণি তা দিয়ে যাকে তুমি ছোঁবে সে স্বর্ণময় হয়ে উঠবে। তার স্পর্শে তুমি আমার প্রাণকে নূতন নূতন আনন্দের দ্বারা পূর্ণ করে হিরণ্ময় করে তুলছ, আর আনন্দিত হচ্ছ; কারণ, আমায় দিয়ে তুমি নিজের স্পর্শমণির পরিচয় পাচ্ছ, আমি না থাকলে তুমি সেই পরিচয় পেতে না। তুমি আমার দ্বারা বিশ্বকে নূতন নূতন করে গ্রহণ করছ। তোমার স্পর্শমণি সকলকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে স্বর্ণময় করে দিচ্ছে। তাতে করে তুমি বুঝছ যে তোমার মধ্যে প্রেমের স্পর্শমণি আছে, তোমার মধ্যে শান্ত সুন্দর মঙ্গলরূপ আছে।

আলোচনা ॥ ১ ॥ তুমি যখন পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে আছ তখন তোমাকে কিছু পেতে চাইতে হয় না, কারণ তখন তুমি আপনাতেই সার্থকতা লাভ করে বসে আছে। তাই তুমি তোমার সম্পদকে ক্ষণে ক্ষণে না-পাওয়ার ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করো, তাকে অভাব ও বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই পূর্ণভাবে জানতে পারো।

আমি যখন গান রচনা করি তখন তার মধ্যে সার্থকতার বোধ কোথায়? আমার অন্তরে যে অনুভূতি আছে তাকে খণ্ডিত করে বিশিষ্ট রূপের মধ্যে প্রকাশ করে তাকে যখন আমি চিত্তক্ষেত্র থেকে হারিয়ে ফেলি তখন আবার তা গানরূপে আমার কানে এসে পৌঁছয়— এই ফিরে পাওয়ার দ্বারা আমি আমার অনুভূতিকে পূর্ণভাবে লাভ করি। মনের ভাবরাশিকে যখন অস্পষ্টতার থেকে আকার দান করবার প্রয়াস করি তখন তার মধ্যে অনেক দুঃখতাপ আছে। কিন্তু এই-যে travail, এই-যে বেদনার প্রক্রিয়া, এর ভিতর দিয়েই আবার ভাবগুলিকে সাহিত্যসৃষ্টিরূপে ফিরে পাই।

আমি যখন কবিতা লিখি তখন আর-একজন পড়ে বলে 'বাঃ বেশ হয়েছে',

তখন আমার নিজের জিনিসকে হারিয়ে যেন অন্যের ভিতর দিয়ে তাকে ফিরে পেলাম। আমার জিনিস তো আমারই থাকতে পারত, তবে কেন আমি এ অভাব বোধ করি? কেন আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে একে অন্যের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে ধরব যাতে অন্যে খুশি হয়? তার কারণ হচ্ছে, অন্যের অনুভূতির ভিতর দিয়ে আমি আমাকে উপলব্ধি করবার আনন্দে আবার সেই কবিতাকে ফিরে পাচ্ছি। আমার অন্তরে যে সম্পদ আছে তাকে এমনি করে বিচিত্র ভোগের মধ্য দিয়ে, সকলের সমাদরের মধ্য দিয়ে ফিরে পাই। বিশ্ববিধাতা তাঁর সম্পদকে সকল মানুষের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নূতন নূতন করে উপলব্ধি করেন। তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্যকে মানুষের আনন্দসম্ভোগের দ্বারা যখন জানতে পারেন তখনই তাঁর যথার্থ আনন্দ হয়।

২॥ নির্জন কারাবাসে থেকেও মানুষ কাব্যরচনা কেন করে? সকল শিল্পীরই এ কথা মনে জাগ্রত থাকে যে, যখন তাদের সৃষ্টি প্রকাশের জগতে যাবে তখন অন্যে তা উপভোগ করবে, অনেক শ্রোতার কানে তার বাণী পৌঁছবে এবং দৃষ্টিতে সেই রচনা প্রতিফলিত হবে। কবি প্রথমে নিজে তার কবিতার শ্রোতা, কিন্তু তার আশা আছে যে পরে সে একমাত্র শ্রোতা থাকবে না— সেই কথা ভেবেই সে কাব্যরচনা করে। তাই যখন লোকে কবিতা লিখে ছিঁড়ে ফেলে তখন বুঝতে হবে যে, তার রচনায় আনন্দ ছিল না, তৃপ্তিলাভ হয় নি— বুঝতে হবে যে, তাতে পূর্ণ সন্তোষ পাওয়া যায় নি, বাসনা অতৃপ্ত থেকে গেছে। ভগবান তাঁর অন্তরের পূর্ণতাকে সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করে ফিরে পাচ্ছেন। তিনি অসংখ্য চিত্তের বহু বিচিত্র আনন্দানুভূতির ভিতর দিয়ে পূর্ণতার আনন্দকে বিশেষ করে লাভ করেন। মানুষ জানে যে, বিশ্বব্যাপারগুলি কেবল ঘটনার সমষ্টি নয়, তার মধ্যে আনন্দস্বরূপের প্রকাশ আছে। রসোবৈ সঃ: সকল জীব সেই আনন্দের পূর্ণতা উপভোগ করে ধন্য হচ্ছে। এবং তারা বুঝছে যে, ক্ষুদ্র স্বার্থের ভোগের মধ্যে সেই পূর্ণতার বিকাশ নেই।

৩২ আজ এই দিনের শেষে

আজ এই দিনের শেষে এই-যে সন্ধ্যা আপন কালো কেশে সূর্যাস্তের মানিক পরেছিল তাকে আমি গেঁথে নিয়েছি। তাকে বিনা সুতায় এই কবিতায় গেঁথে নিয়ে গলার হার করে নিলুম। এইমাত্র এই ক্ষণে ঐ ঘুমিয়ে-পড়া চক্রবাকের

নিদ্রার দ্বারা নীরব নির্জনপদ্মার তীরে সন্ধ্যা যেন তার নির্মাল্য নিয়ে— পূজায় নিবেদিত সোনার ফুলের মালা নিয়ে— সমস্ত আকাশ পার হয়ে আমার মাথায় ছুঁইয়ে দেবে ব'লে এসেছিল। প্রকৃতি সন্ধ্যাকুসুমের এই মালা পূজার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করেছিল। সেই মালা সে আমার মাথায় ঠেকিয়ে গেল, আমি তা অন্তরে অনুভব করলুম। ঐ-যে সন্ধ্যা আস্তে আস্তে অন্ধকার আকাশে নীহারিকাকে স্রোতে ভাসিয়ে দিল, ঐ-যে আকাশে ছায়াপথে তারার দল ক্রমে ক্রমে সরে যাচ্ছে, তা চোখের সামনে পদ্মার তরঙ্গহীন স্রোতের প্রতিবিম্বের মধ্যে দেখছি— যেন সন্ধ্যা সেই তারার দলকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঐ-যে সন্ধ্যা সোনার চেলি রাত্রির আঙিনায় অন্ধকারে বিছিয়ে দিয়েছে, সে যেন নিদ্রায় অলস দেহ নিয়ে সেই চেলি মেলে দিয়েছে। আর ঐ-যে রাত্রির কালো ঘোড়ার রথে চড়ে সন্ধ্যা সপ্তর্ষির ছায়াপথে আগুনের ধুলো উড়িয়ে দিয়ে বিদায় নিল— এই তো সব চোখ মেলে দেখলুম। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই সন্ধ্যা এসেছিল, এত বড়ো কাণ্ড, এত ঘটা কেবল একজন কবির জন্যই হল। তার কাছে এসে সন্ধ্যা তার করুণ স্পর্শ রেখে গেল। অনন্তকালের মধ্যে এমন অনুপম সন্ধ্যা একজন কবির কাছে দেখা দিল, এত আয়োজন এই আশ্চর্য ব্যাপার তাকে স্পর্শ করে চলে গেল। এমনি করে তুমি এক নিমেষের পত্রপুটে অনন্তকালের ধনকে ভরে দাও, এমন যে অমৃত তা ক্ষণকালের ভিতরে সার্থক করে তোল— এই তো তোমার লীলা।

৩৩ জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও

এই-যে আমি চলেছি, জীবনের পথে নানা অভিজ্ঞতার ভিতরে আমার যে বিকাশ হচ্ছে, বিশ্বে এটা একটা সার্থক ব্যাপার। আমি আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চৈতন্যে বিশ্বকে বহন করে নিচ্ছি। আমি চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত করে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হব, এর জন্যে বিশ্বে অপেক্ষা আছে। বিশ্ব আমার ক্রমিক বিকাশের দিকে চেয়ে আছে। আমার চিত্ত যতটুকু পরিণামে গিয়ে ঠেকছে তারই জন্য বিশ্ব প্রতীক্ষা করে আছে।

আমার মধ্যে যে শক্তি, যে আকাঙ্ক্ষা আমাকে চালাচ্ছে তা বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বিশ্বের মধ্যেও এই অগ্রসর হবার, পরিব্যাপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা

আছে— তা কেবল আমারই একলার সামগ্রী নয়। তাই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে বিশ্বে আনন্দ আছে। যদি আমার চলা বিচ্ছিন্ন সত্য হত তবে বিশ্বে এমন গতিবেগ থাকত না, বিশ্ব মুষড়ে যেত। কিন্তু আসলে একটি বৃহৎ ক্ষেত্রে আমার আকাঙ্ক্ষার স্থান আছে। এই অনুভব করে এই কবিতা লেখা।

প্রথম স্তবক॥ আমার মধ্যে কি একান্ত নিঃসঙ্গতা আছে? চিত্ত ছাড়া বাইরে কি আমার কোনো সার্থকতা নেই? হাঁ, আছে। আমার দোসর আছেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমার আকাঙ্ক্ষার সুর মিলছে। অসীমের পথে আমার চলার শব্দ তাঁর কানে গিয়ে ঠেকছে। এই বিশ্বের যে রূপরস-গন্ধ আমার চিত্তে আঘাত করছে তাদের অন্তর্নিহিত আনন্দ আমাকে নিয়েই পূর্ণতা লাভ করছে। আমার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দের বিকাশ হচ্ছে। যখন আমার চিত্ত সংকুচিত হয় না, আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করে, তখনই এই সূর্য চন্দ্র তারা পূর্ণ আলো দেয়— সেই শুভক্ষণে বিশ্বের সৌন্দর্য সুন্দরতম হয়ে প্রকাশিত হয়। আমি পায়ে পায়ে এগোচ্ছি আর বিশ্বজগৎ প্রতি পদ-ক্ষেপে পুলকিত হয়ে উঠছে। আমি যে চলেছি এর শব্দ কেউ শুনছে বা শুনছে না তা আমি জানি না, কিন্তু আমার চলার ধ্বনি এক জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে। আমি জানি যে, আমার এই-যে আলো-অন্ধকার সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে যাত্রা এর পদশব্দ একজন শুনতে পাচ্ছেন।

দ্বিতীয় স্তবক॥ এই-যে জন্ম থেকে জন্মে নব নব জীবনের মধ্য দিয়ে আমার পদ্মটির এক-একটি দল উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, এ তো তোমারই চিত্ত-সরোবরের মধ্যে। তোমার মানসসরোবরে আমি পদ্মটির মতো বিকশিত হয়ে উঠছি, নব নব জীবনে তার দলগুলি খুলে যাচ্ছে। এই ব্যাপার দেখবার জন্য সকল গ্রহতারা চারি দিকে ভিড় করে রয়েছে, এদের কৌতূহলের অন্ত নেই। তারা সব আমারই জন্য আলো দান ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

তোমার যে জগৎকে সৃষ্টি করেছ তা যেন অন্ধকারের বৃন্তের উপর তোমার আলোর মঞ্জরী, যেন তাতে এক সঙ্গে অনেক ফুল ধরে রয়েছে। সেই মঞ্জরী তোমার দক্ষিণ হস্ত পূর্ণ করে রয়েছে। কিন্তু তোমার স্বর্গ তো অমন করে চোখের সামনে প্রকাশিত হয় না; সে লাজুক, সে আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে। তারার বিচিত্র প্রকাশের মতো একটি গুচ্ছে সে ফুটে উঠে নি;

সে যেন পাতার অন্তরালে লুকিয়ে রাখা ফুলের মতো। কিন্তু তোমার এই গোপন স্বর্গটি যেখানে, সেখানেই তোমার সঙ্গে আমার পূর্ণ মিলন। তোমার লাজুক স্বর্গ প্রেমের নব নব বিকাশের ভিতরে একটি একটি দল মেলে দিচ্ছে— মঞ্জরীর মতো তার একেবারে পূর্ণবিকাশ হয় না। আমার অন্তরের ভিতরে তোমার সেই স্বর্গ আমার প্রেমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার পাপড়িগুলি খুলে দিচ্ছে। সেই গোপন উদ্‌ঘাটনের দিকে তোমার দৃষ্টি, তাতেই তোমার আনন্দ।

৩৪ আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে

প্রথম স্তবক ॥ আমি আজ আমার মনের জানালার দিকে আপনাকে স্থাপন করলুম। তোমার চিত্ত যেখানে কাজ করছে সেখানে দৃষ্টি প্রসারিত করবার জন্য যেন তাকে খুললুম। আমি নিজে কী ভাবছি, আমার নিজের কী সুখদুঃখ আছে, আজ আমি তার দিকে তাকালুম না এবং তখন অনুভব করতে পারলুম যে বিশ্বে তুমি আপন-মনে কাজ করছ।

বিশ্বের মাঝখানে তোমার মন যেখানে কাজ করছে সেখানে আমি আমার মনের জানালা খুলে দিচ্ছি। বিশ্বের মাঝে তোমার নিজের কর্ম-চেষ্টাকে আমি যেন আজ অনুভব করছি। তুমি যেন বিশ্বে অব্যবহিত ভাবে কাজ করছ, তোমার মন তাতে ব্যাপৃত আছে।

আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে কী দেখলুম? আমি আজ আমার হৃদয়ের ডাককে বাইরে দেখলুম। আমি যখন অন্তরে নিবিষ্ট হয়ে থাকি তখন অনুভব করতে পারি যে, তুমি আমায় ডাকছ। তখন আমার মধ্যে তোমার যে ডাক রয়েছে তা এসে পৌঁছায়, তোমার আমার মধ্যে যোগাযোগকে জানতে পারি। কিন্তু আজ আমি দেখলুম ফুলের মধ্যে, পাতার মধ্যে, তোমার ডাক রয়েছে। মনের জানালা খুলে দেখি যে, তোমার ঐ অন্তরের বাণী চৈত্রমাসের সমস্ত পত্রপুষ্পের মধ্যে বাইরে ছড়িয়ে আছে। তাই আমার আজ কর্ম নেই, আজ আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। অন্তরের ধ্যানের দ্বারা বাইরের দরজা বন্ধ করে যে ডাক মনের মধ্যে শুনতে চেষ্টা করি আজ সেই আহ্বান-বাণী যেন পাতায়-পাতায় ফুলে-ফুলে চারি দিকে দেখলুম; আজ তাই কেবল চেয়ে আছি— আমার সব কর্ম ঘুচে গেছে।

দ্বিতীয় স্তবক ॥ আমি আমার নিজের সুরে যে গান গাই তা আবরণের মতো। কারণ, আমি গাইবার সময়ে তোমার বিশ্বরাগিণীকে আচ্ছন্ন করে ফেলি। আজ আমার নিজের সুরের সেই পর্দা তোমার গানের দিকে উঠে গেল, তোমার সংগীত আমার কাছে প্রকাশিত হল। আমার নিজের গান বন্ধ হয়েছে— আমি অনুভব করছি যে, আজ সকালের আলোই আমার নিজের গানের মতো। আজ আমার গানের দরকার নেই। কারণ, প্রভাত-আকাশ আমারই গান প্রকাশ করছে, কিন্তু সে গানের সুরটা তোমার। তাই আমার নিজের সুরের প্রয়োজন রইল না। আমারই সংগীত সকালের আলো আর আকাশকে পূর্ণ করে প্রকাশ পাচ্ছে।

আজ আমার মনে হল আমারই প্রাণ তোমার বিশ্বে তান তুলেছে। তোমার বিশ্বে ফুলের সৌন্দর্য আর আকাশের গান— এদের কোনো মানে থাকে না, যদি না আমার মন তাতে সাড়া দেয়। আমার মনের আনন্দের সঙ্গে তাদের যোগ আছে। বিশ্বের যা-কিছু মধুর ও সুন্দর তা আমারই চিত্তে ধ্বনিত হচ্ছে বলেই তা মধুর ও সুন্দর। যে জগৎ আমার চেতনার মধ্যে সাড়া না পায় তা বোবা জগৎ। তাই আমার গানের সুরগুলিকে আজ তোমার জগৎ থেকে ফিরে শিখে নিতে হবে। আমার মন বিশ্বের শ্যামলতায় ও নীলিমায় যে আনন্দ পাচ্ছে তাই তো তোমার গান— সেই গান তো আমায় শিখে নিতে হচ্ছে। আমি আমার নিজের সুর ভুলে গিয়ে নিজের গানকে তোমার সুরে ধ্বনিত দেখছি, আর সে সুর তোমার কাছে শিখে নিচ্ছি।

বিশ্বে যা রমণীয়, যা মধুর দেখছি— যার থেকে রস উপভোগ করছি— তারা চিত্তের বাইরে কোনো বিচ্ছিন্ন সুন্দর বস্তু নয়। আমার মনের মধ্যে যে আনন্দময় স্বাভাবিক শক্তি আছে তাই এ-সবকে সুন্দর করছে। বিশ্বের গাছপালা দেখে যে ভালো লাগছে সেই ভালো লাগাটাই হচ্ছে তার সৌন্দর্য।

ফুলের মধ্যে আমারই গান আছে, কিন্তু সে গান কার সুরে বাজছে? তা তো আমার নিজের সুরের 'সা রে গা মা' নয়— তা যে স্বতন্ত্র একটি সুরে পূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের সৌন্দর্যে আমার যে আনন্দসম্ভোগ আমি তার মধ্যে আমার মনের গান পাচ্ছি, সে গান আমার নিজের বাঁধা 'সা রে গা মা' সুর

নয়— তা তোমার নিজেরই সুর। তাকে আমি শিখে নিচ্ছি। আমি আনন্দিত না হলে আমার নিজের গান হতে পারত না।

আমি যখন নিষ্ক্রিয় থাকি তখনই বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার সুর শুনি, ফুলে পাতায় আমার নামে তোমার ডাককে দেখতে পাই। আজ তাই গাইতে চেষ্টা করছি না, আমার খুশি মনকে বিশ্বে মেলে দিয়েছে। আজ ফুলগুলি যে সংগীতের মতো জেগে উঠেছে এতে আমার হাত আছে, আমার চিত্তই তাদের মাধুর্য দান করছে, অথচ সেই সুর আমার নিজের নয়— সে গান ফুলেরই সুরে রচিত। আমার হৃদয়কে মেলে দিয়ে আমার গানকে তোমার সুরে শুনতে পাবার সৌভাগ্য লাভ করছি।

৩৫ আজ প্রভাতের আকাশটি এই শিশির-ছলছল

এই কবিতা শ্রীনগরে থাকতে একটি বিশেষ অনুভূতি নিয়ে লেখা।—

এই-যে সকালে আকাশটি শিশিরে চক্‌মক্ করছে, ঝাউগাছগুলি রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করছে— এরা বাইরের জিনিস হলে আজ কি অন্তরের এত কাছে আসতে পারত? এই ঝাউ আর আকাশ এমন নিবিড়ভাবে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করেছে যে আমি অনুভব করছি যে, এরা যেন মনের ব্যাপারেরই অংশ, যেন এরা বস্তুজগতের ব্যাপার নয়। কারণ, এরা যদি কেবল বস্তুপিণ্ড দিয়েই গড়া হত তবে এমন করে আমার মনের মধ্যে স্থান পেতে পারত না, বাইরেই থাকত— তাদের সঙ্গে আমার অসীম ব্যবধান থেকে যেত।

আজ ঝাউগাছের ঝালর আর শিশির-ছলছল আকাশ এমন নিবিড় ভাবে আমার মনকে পূর্ণ করেছে যে আমার মনে হচ্ছে যে, এরা যেন আমার হৃদয়ে পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। বাইরের বিশ্ব যেন আমার মনেরই সামগ্রী, যেন অকূল মানসসরোবরে পদ্মের মতো ফুটে রয়েছে। আজ আমি এই ধুলোবালির মধ্যে বস্তুবিশ্বতেই কেবল স্থান পাই নি। আমি আজ জানতে পারলুম যে, এই বিশ্বটি একটি বাণী আর তার মধ্যে আমি একটি বাণী— বিশ্বটি একটি গান, তার মধ্যে আমি একটি গান— এই বিশ্বের মহাপ্রাণের আমি একটি প্রকাশ, অন্ধকারের বুক-ফাটা তারার মতো। আজ যেন আমার অস্থিচর্ম নেই, আজ যেন আমি অন্ধকারের হৃদয় বিদীর্ণ করে উত্থিত অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল আলোক। আজ বিশ্ব আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই কবিতা শ্রীনগরে থাকতে লিখি। তখন আমি সেখানে ঝিলম নদীতে বোটে থাকতুম। একদিন সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে ঝিলমের জলে অন্ধকার নেমে আসছে। আমি ছাদে বসে আছি। ও পারে অন্ধকার জমাট হয়ে আসছে, নদীর স্রোত কালো হয়ে গেছে, চারি দিকে কোনো শব্দ নেই। এমন সময় বুনো হাঁসের দল হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। পদ্মাবক্ষে-বাস-কালে আকাশে হাঁসের পাখার ঝাপট অনেকবার অট্টহাস্যের মতো হাহা করে চমক লাগিয়ে দিয়েছে।

প্রথম স্তবক ॥ আমি ঝিলমে যে জায়গাতে ছিলুম সেখানে স্রোত বেঁকে গেছে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত নদীটাকে একটা বাঁকা তলোয়ারের মতো দেখাচ্ছে। ঝিলমের জল ঝিল্‌মিল্‌ করছিল, তার উপর অন্ধকার নেমে এল। যখন অন্ধকার নদীকে আবৃত করল তখন মনে হল, কে যেন খাপের মধ্যে তলোয়ার পুরে দিল। যেমন ভাঁটার শেষে জোয়ার আসে তেমনি দিনের আলো নিবে গেলে রাত্রির জোয়ার কালীর বন্যা নিয়ে এল। নদীর ধারের রাস্তার পরপারে, পাহাড়ের পায়ের কাছে, দেবদারু গাছগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে; সেই পাহাড়ের নীচেটা যেন আরও ঘন অন্ধকারে আবৃত বলে মনে হচ্ছে। মানুষ যেমন স্বপ্নের মধ্যে ভয়ে বা রাগে চেঁচিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বার করতে পারে না, তেমনি পাহাড়ের তলায় দেবদারুশ্রেণী যেন ঘনায়মান অস্পষ্ট আলোতে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াতে, মনে হচ্ছে, পাহাড় আপনাকে ব্যক্ত করবার প্রাণপণ প্রয়াস করছে কিন্তু পারছে না। সেই আচ্ছন্ন অন্ধকার যেন পাহাড়ের গুম্‌রানো শব্দ, পুঞ্জীভূত ধ্বনি।

দ্বিতীয় স্তবক ॥ নদীর জল অন্ধকারে ঢেকে গেছে, স্রোত দেখা যাচ্ছে না, এমন নীরব নিস্তব্ধ সময়ে শুনতে পেলুম ঠিক মাথার উপরে হংসশ্রেণী শব্দের বিদ্যুৎছটা বিকীর্ণ করে, হুহুহু—স্‌ শব্দের ঝলক দিয়ে কোন্‌ দূরদেশে চলে গেল। আমি কতবার এমনি পদ্মার বোট থেকে হুহুস্‌ শব্দ শুনে মনে করতুম যেন ভুতুড়ে কায়াহীন অট্টহাস্য শুনছি। হে হংসবলাকা, ঝঞ্ঝার মদ খেয়ে মাতাল তোমাদের পাখা যেন শব্দের ঝড় বইয়ে দিয়ে গেল। সুপ্ত আকাশ চমকে উঠল; ভাবল, হঠাৎ এ কী হল! একটা অট্টহাস্য দূর থেকে দূরান্তরে তরঙ্গ

বিস্তার করে চলে গেল। ইন্দ্রলোক থেকে এসে যেমন অপ্সরা সন্ন্যাসীর তপোভঙ্গ করে দেয় তেমনি তোমরা ধ্যাননিরত স্তব্ধতার তপস্যাকে সহসা উড়িয়ে দিয়ে মনকে উতলা করে দিয়ে গেলে। সেই তপোভঙ্গে তিমিরমগ্ন গিরিশ্রেণী শিউরে কেঁপে উঠল। দেবদারুবন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবতে লাগল, এ কী, এ হল কী!

তৃতীয় স্তবক ॥ যে পর্বত-অরণ্য-ধরণী সন্ধ্যায় নীরব নিশ্চল হয়ে ছিল, মনে হল যেন তোমাদের এই পাখার বাণী এক পলকের মধ্যে তাদের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ সঞ্চারিত করে দিল। তারা তো চলে না, কিন্তু পাখার অট্টহাস্যের তরঙ্গঘাতে তাদের অন্তরে চলার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। ছুটে-চলা পাখার বাণী পর্বতের মনকে যেন উদ্‌বিগ্ন করে দিয়েছে, সে যেন মেঘের মতো উধাও হয়ে যেতে চাচ্ছে। মাটিতে শিকড়ের সঙ্গে তরুশ্রেণীর পা বাঁধা আছে, তারা পাখির মতো মাটির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে পাখা মেলে দিয়ে ঐ শব্দ লক্ষ্য করে উড়ে যেতে চায়। তারা বলছে, 'আমরাও শব্দরেখার পিছন পিছন নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যাই।'

এই বাণী যাযাবর (migratory) পাখিদের অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করবার বাণী। পরিচিত বাসায় তাদের চিরস্থিতি নয়। সমুদ্রপারে কোন্ অজ্ঞাত দেশে আর-এক বাসা আছে, বাসা-ছাড়া পাখির দল তার অনুসরণ করে চলেছে।

চতুর্থ স্তবক ॥ হে বলাকা, তুমি মন থেকে স্তব্ধতার আবরণ উঠিয়ে দিয়ে গেলে। এই আবরণ মায়ার জালের মতো ছিল, তাই স্তব্ধতার ভিতরে যে গতি ছিল তা আগে দেখি নি। কিন্তু পাখার শব্দ যখন বেগের আবেগ জাগালো তখন আমার কাছে কিছুই নিশ্চল রইল না, সব সচল হয়ে গেল। আমি শুনতে পাচ্ছি সর্বত্রই কার প্রসারিত পক্ষ আকাশবিস্তৃত হয়ে উড়ছে। তাই আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তৃণদল ডানা ঝাপটাচ্ছে, তারা মাটির আকাশে উড়ছে। মাটির নীচে বীজের বলাকা যেন প্রাণের চঞ্চলতায় অঙ্কুরের পাখা মেলেছে, তারা উড়ছে। তৃণের দলও যেন বলাকা, তারা মাটির আকাশে ডানা মেলে মেলে চলেছে। আমার কাছে কিছুই অব্যক্ত রইল না। এই হিমালয় পৃথিবীর নীড় থেকে আপন অগ্নিপক্ষ বিস্তার করে আকাশে উড়ছে। এই পাহাড়ও চলবার পথে, একদিন ক্ষয় হতে হতে এই পাহাড় কোথায় যাবে তার

ঠিকানা থাকবে না। এই বন মুক্ত পাখা মেলে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে, এক অজানা লোক থেকে অন্য অজানা লোকে ক্রমাগত চলেছে। প্রকৃতির সব বস্তু উড়ছে; তাদের পাখার স্পন্দনে অন্ধকার চমকে কেঁদে উঠছে। শিশুর কান্নার মতো নক্ষত্রবিন্দুতে যেন আকাশের কান্না ছড়িয়ে গেছে।

পঞ্চম স্তবক ॥ প্রকৃতিতে তো দেখলুম যে, পর্বত অরণ্য স্তব্ধ হয়ে নেই, তারা চলেছে। তেমনি মানুষের যত আকাঙ্ক্ষা কামনা ভাবনা তারাও লোকালয়ের তীরে তীরে এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে, দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কয়েকটি পূর্ববর্তী কবিতায়ও এই কথাটা ছিল। কোন্ অস্পষ্ট অতীতমানুষের চিত্তধারায় সেই ভাবনা কামনার জন্ম হয়েছে, কিন্তু তারা সেই আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভাবীকালের বাসা কোথায় জানি না কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে, মানুষের চেষ্টা-বাণী-ইচ্ছা-চিন্তা-কর্ম-স্রোত দলে-দলে আকাশ পূর্ণ করে চলেছে। মানুষের এই-যে অপূর্ণ অশ্রুত বাণী অতীত হতে যাত্রা করে চলেছে, আমি শুনলুম তারা যেন বলাকার পাখার শব্দে জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আমার অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করেও দেখলুম যে, আমার মনের বাসা-ছাড়া পাখি আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অবিশ্রাম চলেছে—যা-কিছু গতিশীল, যা-কিছু উড়ে চলেছে, তাদের সহযাত্রী হয়ে অসংখ্য পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে। এরা কোন্ দিকে চলেছে জানি না, কিন্তু আমি বসে বসে নিখিলের এই পাখার ঝাপট শুনছি। সমস্ত আকাশ পাখার এই বাণীতে ভরে গেছে— 'এখানে নয়, এখানে নয়, এ বাসায় থেমে থাকবার নয়, আর-এক জায়গায় যেতে হবে।'

আমার বলাকা চারি দিকে নিখিলের এই বার্তা শুনতে পাচ্ছে।

'বলাকা' বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না। কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং 'বলাকা' বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। 'বলাকা' নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল যখন নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তার ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে— এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে

অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধু-তীরে আর-এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল— এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চলেছে ; তাদের কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ তা জানি না। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে! কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি না, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী— 'এখানে নয়, এখানে নয়।'

৩৮ সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী

আমার অন্তরে আমার প্রেমে নূতনত্বের অন্ত নেই। কিন্তু তাকে বাইরে দেখাই কেমন করে? দেহ উৎসুক হয়ে বলছে যে, অন্তরের এই সংগীতকে, বেদনাকে, নবীনের উচ্ছ্বাসকে কোনো রকমে যদি প্রকাশ করতে পারি তবে আমার ব্যাকুলতার তৃপ্তি হয়। দেহ যেন তার নূতন বসনের মধ্য দিয়ে সেই বেদনাকে প্রত্যক্ষ করে দেখাতে চাচ্ছে। আমার অন্তরে যে গানের ব্যাকুলতা আছে তা বাঁধা-সুরকে ছাড়িয়ে নূতন নূতন তানের উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হয়। আমার দেহ আজকার এই নূতন কাপড়ে লীলায়িত হয়ে গানের সেই তান লাগিয়ে দিল। আপনার প্রতিদিনের বাঁধা-গণ্ডীকে সে ছাড়িয়ে গেল।

আমার আপনাকে দেওয়া শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তবু আমার ইচ্ছা হয় প্রতিদিন আপনাকে নূতন করে নিবেদন করি। আমার মনের সেই বেদনাকে, সেই নূতনতার উৎকণ্ঠাকে ক্ষণে ক্ষণে কেমন করে বোঝানো যায়? তোমার কাছে ক্ষণে ক্ষণে আমার নূতন হতে ইচ্ছা হয়, তাই এই নূতন কাপড় প'রে আজ আপনাকে যেন এই প্রথম তোমার হাতে সমর্পণ করলুম।

চাঁদের যে আলো, তা যেন তার চোখের গান। চাঁদের রাতে যখন দুজনে কেবল মিলিত হব সে সময়ে আমাদের মধ্যে কোনো কথা হবে না— সে তো কথা কইবার সময় নয়। সেই স্তব্ধতাকে কোনো শব্দ তো বিক্ষিপ্ত করে না, অথচ সেই মধুর মুহূর্তের অন্তরের মধ্যে একটা গান আছে। সেই

অব্যক্ত সংগীতের সুরটিই আমার কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে রঙের হিল্লোলে ব্যক্ত হবে।

প্রেমের নূতন নূতন রঙ ক্রমাগতই বিচ্ছুরিত হয়, তার যেন আশ মিটতে চায় না। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারই প্রেরণায় আমার কাপড়ে নূতন নূতন রঙ দেখা দেয়। আমার আজকার এই বসনের রঙ নীল, এ যেন অকূলের দিশাহারা নীল। আজ আমি অন্তরের অসীমতাকে প্রকাশ করছি— আমার দেহ অকূলের সুদূরের নীলকে ধারণ করছে। আজ এই কাপড় নবমেঘের বাণী বহন করে আনছে। নদীর এই নিকটের পারের রঙ সবুজ কিন্তু ও পারের যে অরণ্য দূরে তার রঙ নীল— সেই রঙ আজ আমার কাপড়ে। যে নবমেঘ দিশাহারা হয়ে আকাশে বেরিয়ে পড়েছে সেই সজল মেঘের বাণী আমার কাপড়ের রঙের মধ্যে। চিত্তেও সেই নবীনতার প্রতিরূপ আছে।

৪৪ যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে

প্রথম স্তবক ॥ কে বলেছে, যৌবন, তুমি সুখের খাঁচাতে ছোলা জল খেয়ে বাস করবে? কে বলেছে তুমি বাঁধা নিয়মে আহার করবে আর ঝিমবে আর তোমার খাঁচার চারি দিকে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে? আরে বাপু, তুমি কাঁটাগাছের উপরে চ'ড়ে ফিঙের মতো পুচ্ছ নাচাও না কেন? খাঁচার মধ্যে বসে বসে তোমার বাঁধা খোরাকি খেয়ে কাজ কী?

তুমি পথহীন সাগরপারের পথিক; তোমার ডানা চঞ্চল, অক্লান্ত। তোমাকে আজ অজানা বাসা সন্ধান করে নিতে হবে, জানার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ঝড়ে যে বজ্র আছে তার মধ্যে দুঃখ বেদনা থাকুক-না কেন, তাকেই তুমি ঝড় থেকে ছিন্ন করে নিয়ে আসতে পারো— আরামের জিনিসকে তুমি চাও না— এই তোমার দাবি।

দ্বিতীয় স্তবক ॥ যৌবন, তুমি কি আয়ুকে চাও? তুমি কি নিরাপদের চণ্ডীমণ্ডপে গম্ভীর হয়ে বসে থাকবে? এই কি তোমার আকাঙ্ক্ষা? তুমি কি আয়ুর কাঙাল হয়ে থাকতে চাও? না, তুমি যাকে সন্ধান করছ সে যে মরণ। তুমি তো আয়ুর স্পৃহা রাখ না, তুমি যে অমৃতরস পান করতে চাও— মৃত্যুর ভিতর দিয়েই সেই সুধাকে আহরণ করবে। মৃত্যুই সেই অমৃতের পাত্রকে বহন করছে। তুমি জীবনের যে সার্থকতাকে চাও তোমার সেই

প্রিয়া মরণ-ঘোমটার ভিতরে অবগুণ্ঠিতা— সে মানিনী। তাকে পাবার সফলতাতেই তোমার পরিতৃপ্তি। তার আবরণকে উদ্‌ঘাটিত করে তুমি তাকে দেখো।

তৃতীয় স্তবক ॥ কোন্ তান তুমি সাধতে চাও? শাস্ত্রকারের পোকাকাটা শুকনো তুলট কাগজের পুঁথির মধ্যে কি তোমার বাণী আছে? তোমার বাণী যে দক্ষিণ-হাওয়ার বীণায় আছে। তার সুরে যে অরণ্য জেগে ওঠে। সেই বাণীকে কি তুমি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বার করবে? যে বাণী শুনে অরণ্যে নবকিশলয়ের উদ্‌গম হয় সেই বাণীই তোমার। তুমি তো পুঁথির পাতার মধ্যে খড়্ খড়্ সর্ সর্ করছ না, তুমি ঝড়ের ঝঙ্কার শুনে বেরিয়ে পড়। তোমার বাণী ঢেউয়ে তার বিজয়ডঙ্কা বাজায়।

চতুর্থ স্তবক ॥ এই-যে একটুখানি প্রাণের গণ্ডীর মধ্যে কোনো রকমে বেঁচে আছি, তোমায় এই মায়া কাটিয়ে উঠতে হবে। তুমি যে চিরকালের— যতদিন মানুষ বাঁচবে ততদিন তোমার বিজয়ডঙ্কা বাজবে। সূর্যের আলোক যেমন কুয়াশাকে ছিন্ন করে ফেলে, তেমন তোমার যে দীপ্তিশিখা তা বয়সের এই কুহেলিকাকে ছিন্ন করে কেটে ফেলবে। যেমনতর কুঁড়ির বাইরে যে পত্রপুট তা সেই খড়্খড়ে পাতা কেটে ফেলে ভিতরের ফুলটিকে উদ্‌ভিন্ন করে, তেমনি বয়স-রূপ কুঁড়ির বাইরের যে আবরণ সেটা হয় জীর্ণ— তার বক্ষ দু ফাঁক করে তোমার অমর স্বরূপটি— যা ঝরবে না, মরবে না, তোমার সেই চিরনবীন প্রকাশটি— জরা বিদীর্ণ করে ফুটে উঠুক।

পঞ্চম স্তবক ॥ তুমি কি ভোগের গ্লানিতে জড়িত হয়ে ধূলিতে আসক্ত হয়ে থাকবে? তুমি কি ভোগের আবর্জনার বোঝার গ্লানিভারে লুণ্ঠিত হয়ে থাকবে? তোমার যে পবিত্র আলোর উজ্জ্বলতা আছে, মাথায় সোনার মুকুট আছে। যে কবি তোমার কবিতা রচনা করে সে হচ্ছে অগ্নি— তার ঊর্ধ্বশিখা উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকে। আগুন তোমার কবি, সে তোমার জয়গান করে। সূর্য তোমার মধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দেখে। তুমি কি আত্মসুখে ভুলে ধুলায় পড়ে থাকবে? সূর্য যে তোমার মাথার উপর উঠবে, তাকে কি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করবে না?

বলাকার ৪ ও ৭ -সংখ্যক কবিতার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন—

[৪] বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বানশঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়— অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে। সময় এলেই, উদাসীন ভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।

[৭] শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তা হলে দেখতে পাই, সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না— ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না ব'লেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তাঁর চলে যেতে হয়— পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলই সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে সম্বন্ধ সে কখনোই চির-কালের নয়; তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেইরকম। সে সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো খসে পড়েছে, তাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয় নি।

তাজমহলের শেষ দুটি লাইনের সর্বনাম 'আমি' ও 'সে'— যে চলে যায় সেই হচ্ছে 'সে', তার স্মৃতিবন্ধন নেই; আর, যে অহং কাঁদছে সেই তো ভার-বওয়া পদার্থ। এখানে 'আমি' বলতে কবি নয়, 'আমি-আমার' ক'রে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। 'আমার বিরহ— আমার স্মৃতি— আমার তাজমহল' যে মানুষটা বলে তারই প্রতীক ওই গোরস্থানে; আর মুক্ত হয়েছে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী— তাকে কোনো-একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারতসাম্রাজ্যে, না শাজাহান-নামরূপ-ধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে।

—প্রবাসী। ১৩৪৮ কার্তিক, পৃ ১২৩

কবি শেষোক্ত কবিতার প্রসঙ্গেই শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে লেখেন—

যে প্রেম সম্মুখ-পানে···

উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা। ইত্যাদি।

কবিতা লিখেছি বলেই যে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই। মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল, তখন

নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মানের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্তর্যামীর কাজ সারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে। এখন বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে বের করতে হবে— সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি তেমনি তুমিও আছ এবং আরও দশজন আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিয়ে সর্বদাই হট্টগোল বেধে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে আমার ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি— যদি সন্তোষজনক না মনে করো, তোমার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।

বেগমমণ্ডলীপরিবৃত বাদশার যে প্রেম, কালিদাস হংসপদিকার মুখ থেকে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে প্রেম চলিত পথের। ধুলোর উপরে তার খেলাঘর। মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিল ব'লেই বিরহের একটি সজীব বীজ সেই খেলাঘরের ধূলির উপরে পড়ে ধূলি হয়ে যায় নি, ক্লান্তিপ্রবণ বিলাসের ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তার ভিতরকার অমরতা ক্ষণকালের পরমা স্মৃতিকে বহন করে রয়ে গেল। যে বেদনাকে সেই স্মৃতি ঘোষণা করছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তার আর-একটি ঘোষণা আছে; তার বাণী হচ্ছে এই যে, সেই শাজাহানও নেই, সেই মমতাজও নেই, কেবল তাদের যাত্রাপথের এক অংশের ধূলির উপরে জীবনের ক্রন্দনধ্বনি বহন করে রয়ে গেছে তাজমহল। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমের মধ্যে একটা মহিমা আছে, দুই তপোবনের মাঝখান দিয়ে সে গেছে অমরাবতীর দিকে— তার সংকীর্ণ খেলাঘরের বেড়া ভেঙে গিয়েছিল, তাই প্রথম বিলাসবিভ্রমের বিস্মৃতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সে তপঃপূত চিরস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে; সে প্রেম দুঃখবন্ধুর পথে অন্তহীন সম্মুখের দিকে চলে গিয়েছে, সম্ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি নয়।

আমি জানি শাজাহানের এই অংশটি দুর্বোধ। তাই এক সময়ে এটাকে বর্জন করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম, কে বোঝে কে না-বোঝে সে কথার বিচার আমি করতে যাব কেন— তোমাদের মতো অধ্যাপকদের আক্কেল দাঁতের চর্ব্যপদার্থ না রেখে গেলে ছাত্রমণ্ডলীদের ধাঁধা লাগবে কী উপায়ে?
২১ শ্রাবণ ১৩৪৪

—রবীন্দ্রনাথের চিঠি

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলাকার ২২-সংখ্যক কবিতাটির সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ লিখিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শান্তং শিবং অদ্বৈতং। য়িহুদী পুরাণে আছে— মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়— তাকে স্বর্গ ব'লে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।—

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারই নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারই আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি—
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্য মিথ্যা, ভালো মন্দ, জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই-সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায় ?— অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে : সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে, জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে, অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং— মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন ; তখন সে সুখকেই চায়,

সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে— তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না— সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনাসংগম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া তা নয়, সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই-যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা, জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে? সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে: অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। গময় এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

—সবুজ পত্র। আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

বলাকার ব্যাখ্যায় লেখা না হইলেও— 'বলাকা' তখনও সুদূর ভাবীকালে প্রচ্ছন্ন— রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পুরাতন নিবন্ধের বিশেষ বিশেষ অংশ 'বালক' (১২৯২) মাসিক পত্রের বিভিন্ন সংখ্যা হইতে এ স্থলে সংকলন করা যাইতে পারে। বলাকার ভাবধারা-যে রবীন্দ্রচিত্তের চিরপ্রবাহিণী ধারা মাত্র, প্রকাশের বিস্ময়কর অপূর্বতা সত্ত্বেও, কবির ধ্যানধারণায় বা মননে একেবারে নূতন নয়, এই স্বল্পসংকলন হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। বলাকা কাব্যে সর্বত্র অনুস্যূত ভাবনার সহিত, বিশেষতঃ 'ছবি' (৬) ও 'শাজাহান' (৭) কবিতার বক্তব্যের সহিত, 'রুদ্ধগৃহ'[২] ও 'পথপ্রান্তে'[২] প্রবন্ধের অথবা 'উত্তর প্রত্যুত্তর'[৩] পত্র-প্রবন্ধের সম্পূর্ণই মিল দেখা যায়—

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধিভবন কৃপণের মতো মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণপ্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে।…

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে; পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই-বোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে, আমাদের কোনো ভয় থাকে না; কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু, রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়।…

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য-ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন! হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে

২ উত্তরকালে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলিত। 'রুদ্ধগৃহ' সম্পর্কে '২১।৯।৩৪' তারিখের এক পত্রে কবি শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন— দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০, পৃ ১৭৭— 'দেখা যাচ্চে পরবর্ত্তীকালের বলাকার ভাবের সঙ্গে এই লেখার মিল আছে।' অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ চিঠিও বিশেষ মননের বিষয়।

৩ পূর্বপ্রকাশিত 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধের আলোচনাসূত্রে এই প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছেন 'শ্রীঅঃ'। ইনি কবিবন্ধু 'শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল' এরূপ অনুমান করা হয়।

তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন! তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও; জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

…স্নেহ প্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই।…

দ্বার খুলিয়া দাও। সূর্যের আলো দেখিয়া, মানুষের সাড়া পাইয়া, চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু, পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

—রুদ্ধগৃহ। বালক। ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক

প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত, তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত। নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর-সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়। বৃহৎ প্রেমের প্রভাবে ক্ষুদ্র প্রেমের সূত্রসকল টুটিয়া যায়। জগৎ তাই চলিতেছে, নইলে আপনার ভারে আপনি অচল হইয়া পড়িত।

ঐ দেখো, কচি ছেলেটিকে বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে।… ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গৃহের মতো মধুর করিয়াছে কে? কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন? মা কেন মনে করে এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনন্তের অবসান? অনন্তের পথে যেখানে পৃথিবীর সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে মায়ের হাত ধরিয়া মাকে সেই ছেলের রাজ্যে লইয়া যায়— সেখানে শতকোটি সন্তান।…

একটি ছেলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া দেয়। যার ছেলে নাই তার কাছে অনন্ত স্বর্গের একটা দ্বার রুদ্ধ; ছেলেটি আসিয়া স্বর্গের সেই দ্বারটি খুলিয়া দেয়; তার পর তুমি চলিয়া যাও, সেও চলিয়া যাক। তার কাজ ফুরাইল, তার অন্য কাজ আছে।

প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর-একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইজন্যই তাহাকে পথের আলো বলি। ...একটিকে ভালোবাসিলেই আর-একটিকে ভালোবাসিতে শিখিবে। অর্থাৎ এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

...পথ চলিতে আর-কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।

—পথপ্রান্তে। বালক। ১২৯২ অগ্রহায়ণ

জগতের মধ্যে আমাদের এমন 'এক' নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে 'এক' হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে— এক কাড়িয়া আর-এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের 'এক' যৌবনের 'এক' নহে, যৌবনের 'এক' বার্ধক্যের 'এক' নহে, ইহজন্মের 'এক' পরজন্মের 'এক' নহে। এইরূপ শতসহস্র একের মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই এক মহৎ 'এক'এর দিকে লইয়া যাইতেছে। সেই দিকেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, পথের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে আসি নাই··· আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। অনুরাগ বদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে, অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে। প্রকৃতির বৈরাগ্য দেখো। সে সকলকেই ভালোবাসে বলিয়া কাহারও জন্য শোক করে না। তাহার দুই-চারিটা চন্দ্র সূর্য গুঁড়া হইয়া গেলেও তাহার মুখ অন্ধকার হয় না··· অথচ একটি সামান্য তৃণের অগ্রভাগেও তাহার অসীম হৃদয়ের সমস্ত যত্ন সমস্ত আদর স্থিতি করিতেছে, তাহার অনন্ত শক্তি কাজ করিতেছে। ··· প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমাণ স্রোতের উপরে সীল-মোহরের ছাপ মারিয়া 'আমার' বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে।··· বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে, অন্য পথ দেখি না। সোলাপুর। ২৬ আশ্বিন [১২৯২]

—উত্তর প্রত্যুত্তর। বালক। ১২৯২ পৌষ

রবীন্দ্রসদনে-সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির প্রমাণে, বর্তমান গ্রন্থে কয়েকটি কবিতার পাঠ এবং রচনার স্থানকাল-সম্পর্কিত তথ্য সংশোধিত। দ্বাদশখণ্ড 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে বলাকা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যাইবে। বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য তথ্য এই যে, ২৮-সংখ্যক কবিতাটির প্রথম স্তবকের পরে এই একটি নূতন স্তবক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়—

ফুলের পাতার পুটে রেখে দিলে তব নাম
করে সে প্রণাম—
তোমার নামের ভরে মাথা হয় নিচু,
তার বেশি আর নয় কিছু।
দিলে জনমের প্রাতে
মোর হাতে
শুধু শূন্য সাজিখানি, রক্তে দিলে শান্তিহীন খোঁজা;
শূন্য ভ'রে এনে দিই পূজা।

বলাকার অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রে কবিপ্রদত্ত নাম লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বলাকার তৃতীয় মুদ্রণেও প্রথম আটটি কবিতার নাম ছিল। বিভিন্ন পত্রিকায় মুদ্রণের তালিকা অতঃপর সংকলিত হইল—

১	সবুজের অভিযান	সবুজ পত্র	১৩২১ বৈশাখ
২	সর্বনেশে	সবুজ পত্র	১৩২১ শ্রাবণ
৩	[আহ্বান]	সবুজ পত্র	১৩২১ জ্যৈষ্ঠ
৪	শঙ্খ	সবুজ পত্র	১৩২১ আষাঢ়
৫	পাড়ি	সবুজ পত্র	১৩২১ ভাদ্র
৬	ছবি	সবুজ পত্র	১৩২১ অগ্রহায়ণ
৭	তাজমহল [শাজাহান]	সবুজ পত্র	১৩২১ অগ্রহায়ণ
৮	চঞ্চলা	সবুজ পত্র	১৩২১ পৌষ
৯	তাজমহল	সবুজ পত্র	১৩২১ পৌষ
১০	উপহার	সবুজ পত্র	১৩২১ মাঘ
১১	বিচার	সবুজ পত্র	১৩২১ মাঘ

১২	দেওয়া নেওয়া	প্রবাসী	১৩২২ আশ্বিন
১৩	যৌবনের পত্র	সবুজ পত্র	১৩২২ আষাঢ়
১৪	মাধবী	প্রবাসী	১৩২২ চৈত্র
১৫	আমার গান	সবুজ পত্র	১৩২২ বৈশাখ
১৬	রূপ	সবুজ পত্র	১৩২২ ফাল্গুন
১৭	প্রেমের পরশ	মানসী	১৩২২ আষাঢ়
১৮	যাত্রা	সবুজ পত্র	১৩২২ শ্রাবণ
১৯	জীবন মরণ	ভারতী	১৩২২ আশ্বিন
২০	যাত্রাগান	প্রবাসী	১৩২২ বৈশাখ
২১	অগ্রণী	প্রবাসী	১৩২২ বৈশাখ
২২	মুক্তি	প্রবাসী	১৩২১ ফাল্গুন
২৩	দুই নারী	সবুজ পত্র	১৩২১ ফাল্গুন
২৪	স্বর্গ	প্রবাসী	১৩২১ ফাল্গুন
২৫	এবার	সবুজ পত্র	১৩২১ ফাল্গুন
২৬	আবার	সবুজ পত্র	১৩২১ ফাল্গুন
২৭	রাজা	ভারতী	১৩২৩ আষাঢ়
২৮	দেনাপাওনা	ভারতী	১৩২২ চৈত্র
২৯	তুমি আমি	সবুজ পত্র	১৩২২ বৈশাখ
৩০	অজানা	সবুজ পত্র	১৩২২ ভাদ্র-আশ্বিন
৩১	পূর্ণের অভাব	ভারতী	১৩২২ চৈত্র
৩২	সন্ধ্যায়	ভারতী	১৩২২ শ্রাবণ
৩৩	প্রেমের বিকাশ	প্রবাসী	১৩২১ চৈত্র
৩৪	খোলা জানালায়	প্রবাসী	১৩২১ চৈত্র
৩৫	'মানসী'	মানসী	১৩২২ মাঘ
৩৬	বলাকা	সবুজ পত্র	১৩২২ কার্তিক
৩৭	ঝড়ের খেয়া	প্রবাসী	১৩২২ পৌষ
৩৮	নূতন বসন	সবুজ পত্র	১৩২২ অগ্রহায়ণ
৩৯	শেক্স্‌পিয়র	সবুজ পত্র	১৩২২ পৌষ
৪০	চেয়ে দেখা	সবুজ পত্র	১৩২২ ফাল্গুন

৪১		সবুজ পত্র	১৩২২ চৈত্র
৪২	অপমানিত	মানসী	১৩২৩ বৈশাখ
৪৩	পথের প্রেম	ভারতী	১৩২৩ বৈশাখ
৪৪	যৌবন	প্রবাসী	১৩২৩ বৈশাখ
৪৫	নববর্ষের আশীর্বাদ	সবুজ পত্র	১৩২৩ বৈশাখ

উল্লিখিত তালিকা হইতে বুঝা যায় বলাকার সমুদয় কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশত এবং ৩ এবং ৪১ সংখ্যাঙ্কিত কবিতা ব্যতীত সবগুলিই বিচিত্র শিরোনাম -যুক্ত ছিল ; বন্ধনীমধ্যে তৃতীয়মুদ্রণ বলাকায় ব্যবহৃত বিশেষ শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ৩৯-সংখ্যক কবিতাটি মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়রের মৃত্যুর ত্রিশততম স্মৃতিবার্ষিক উৎসব -উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত হইয়া কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ -সহ A Book of Homage to Shakespeare, 1916 গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত অনুবাদ রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত আছে।

শান্তিনিকেতন -আশ্রমে অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলাকার অনেক-গুলি কবিতার যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কর্তৃক অনুলিখিত হইয়া ১৩২৯-৩০ সালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় অনুলেখক মহাশয়ের বিশেষ সৌজন্যে, বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ের সূচনাতেই, যেমন সেই ব্যাখ্যা ও আলোচনার আনুপূর্বিক সংকলন সম্ভবপর হইয়াছে, তেমনি মূল পাণ্ডুলিপির বহুলাংশ মিলাইয়া দেখিবারও সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়— কবি এই অনুলেখন সম্ভবতঃ আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং বহু স্থলেই বহু যোগ-বিয়োগ করিয়া বিশেষ সম্পাদনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

—